সাইকেলে

বল্কান ভ্রমণ

ভূ-পর্য্যটক

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

তিন টাকা

—প্রাপ্তিস্থান—

১। গ্রন্থকার,
১৮৬ বহুবাজার ষ্ট্রীট (উপরতলা)
কলিকাতা ১২।

২। শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৩ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রকাশক—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
১৮৬ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২
মুদ্রাকর—শ্রীচণ্ডীচরণ সেন, পি-বি প্রেস,
৩২ই ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা।

ভূমিকা

আমার ভ্রমণকাহিনী সম্বলিত যে কয়খানি বই প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলি পাঠকসমাজে খুব যে অনাদৃত হয়েছে, তা' নয়। বল্কান অঞ্চলে আমার ভ্রমণকাহিনী সম্বন্ধেও বহু পাঠক আমাকে বই লিখতে অনুরোধ করেছেন। আর তাঁদের অনুরোধে বইখানা যখন লিখতে মনস্থ করলাম, তখন ভেবেছিলাম—সমগ্র বল্কান অঞ্চল সম্বন্ধেই বইখানা লিখব। বল্কান অঞ্চল বলতে যুগোশ্লাভিয়া, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, এ্যালবেনিয়া, গ্রীস এবং ইউরোপীয় তুরস্ক বুঝায়। ইউরোপীয় তুরস্কে আমার ভ্রমণকাহিনী "সাইকেলে পশ্চিম এশিয়ায়" বইখানায় লিপিবদ্ধ হয়েছে। অন্যান্য দেশগুলি সম্বন্ধে লিখবার আগ্রহ থাকলেও অপরিহার্য্য কারণে বর্ত্তমান বই-এর কলেবর বৃদ্ধি করা সম্ভব হল না। আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী দেখে আর আগামী দিনের কথা ভেবে, বিশেষতঃ বল্কান অঞ্চল আগামী যুদ্ধে যে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে, সেকথা স্মরণ ক'রে বল্কান অঞ্চল সম্বন্ধে এই বইখানা বর্ত্তমানে প্রকাশ করতে উৎসাহিত হলাম।

ইহা উল্লেখযোগ্য যে আমি ভ্রমণে বেরিয়েছিলাম—মাত্র এগারোটি টাকা নিয়ে পায়ে হেঁটে। সারা উত্তর ও মধ্য ভারত (দক্ষিণ ভারত আমি ঘুরেছিলাম পরে। বর্ত্তমান পর্য্যন্ত বার আটেক সারা ভারতবর্ষ, আসাম থেকে করাচী, কাশ্মীর

থেকে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত, আমার ভ্রমণের সুযোগ হয়েছে, অবশ্যই ট্রেনে।) ঘুরে চট্টগ্রাম হয়ে ব্রহ্মদেশে আমি যাই। ব্রহ্মদেশে গিয়ে সাইকেলে ভ্রমণের সঙ্কল্প করি, যদিও সাইকেল চড়া আমি মোটেই জানতাম না। দিন তিনেকের মধ্যে সাইকেল চড়া শিখে সেই সাইকেলেই রওনা হই।

লক্ষ লোকের চোখের সামনে সহস্র প্রহরীর পাহারায় থেকেও যখন কলকাতা সহরে চুরি ডাকাতি রাহাজানি অহরহই হয়, তখন নির্জ্জন পাহাড়ে প্রান্তরে চোর ডাকাতের কবলে পড়া কোন পর্য্যটকের পক্ষে মোটেই অসম্ভব কোন ব্যাপার নয়। লক্ষ্ণৌর মত জনবহুল সহরে হায়েনার উপদ্রবে এবং আক্রমণেও যখন সহরবাসী ভীতসন্ত্রস্ত ও রক্তাপ্লুত হয়, কলকাতার রাস্তায়ও যখন শার্দ্দূল শাবকের বিচরণ চোখে পড়ে, তখন শ্বাপদের জন্মভূমি পাহাড়ে পর্ব্বতে, বনে জঙ্গলে উহাদের দৈবাৎ সাক্ষাৎ পাওয়াও মোটেই অসম্ভব কিছু নয়। বস্তুতঃ দু-একটি যায়গায় ঐরূপ তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভের দুর্ভাগ্য আমার হয়েছিল। তবে একবার আমার প্রাণাশঙ্কা ঘটেছিল উত্তর চীনের একটি যায়গায়, আর দ্বিতীয়বার আরবের মরুভূমিতে। কিন্তু সকল দুর্ব্বিপাক সহজেই শেষ পর্য্যন্ত অতিক্রান্ত হওয়া গিয়েছে, নিশ্চয়ই আমার চেষ্টার অতিরিক্ত কোন শক্তির প্রভাবে।

আর একটি কথা। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে অমি ভ্রমণ করে থাকলেও কিন্তু ভ্রমণের উদ্দেশ্য নিয়েই আমি প্রথম ভ্রমণে

বেরিয়েছিলাম না, ভ্রমণে বেরিয়েছিলাম রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে।

অপর একটি কথা। আমি যে কোন দিন বই লিখব, আর বই লিখেই যে সংসার চালাব—এমন অসম্ভব ইচ্ছা আমার মনে কোনদিন ছিল না। কারণ বই লেখা ত দূরের কথা, ভাল ক'রে একখানা চিঠি লেখারও ক্ষমতা আমার ছিল না, যদিও বিভিন্ন বিষয়ে আমি আজ পর্য্যন্ত বহু বই লিখেছি। তা' হলেও আমি যে সাহিত্যিক নই বা সাহিত্যিকসুলভ গুণাবলীও যে আমার নেই, সে-বিষয়ে আমি যথেষ্ট সচেতন আছি। তাই ত মনে মনে আমার ভয় ও ভাবনা—"এই বই খানাও পাঠক সমাজে সমাদৃত হবে ত ?" যদি হয়, তবেই নিজের পরিশ্রম ও অর্থব্যয় আমি সার্থক জ্ঞান করব।

কলিকাতা,
২০ জুলাই, ১৯৫২

গ্রন্থকার

যুগোশ্লাভিয়া

বুলগেরিয়া

সাইকেলে
বল্কান ভ্রমণ

যুগোশ্লাভিয়া

"মানুষের কাছে
যাওয়া-আসা ভাগ হ'য়ে আছে।
তাই তার ভাষা
বহে শুধু আধখানা আশা।
আমি চাই সেইখানে মিলাইতে প্রাণ
যে-সমুদ্রে 'আছে' 'নাই' পূর্ণ হয়ে রয়েছে সমান॥"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পার্ব্বত্য পথ। রাস্তার এক পাশে পাহাড়, অপর পাশে গভীর খাত। সারাদিনের পথ চলায় শ্রান্ত দেহ; গন্তব্যস্থল দূরে হলেও পা আর ওঠে না। শ্বাপদশঙ্কুল পাহাড়ে নিস্তব্ধ পরিবেশ রাত্রির জমাট অন্ধকারে বিপজ্জনক হয়ে উঠল। ঘুম ও অবসন্নতায় আমার চোখ বুজে আসলেও আমাকে জোর করেই চলতে হল; পদে পদে ভয়, কখন বা পদস্খলন্ হয়! পদস্খলন হলে আর রক্ষা নেই!

যুগোশ্লাভিয়া দেশের দ্বিতীয় বড় সহর জাগ্রেব আমার গন্তব্যস্থল, আমি এসেছি ইতালীর ত্রিয়েস্ত বন্দর থেকে।

ইউরোপ ও আমেরিকার বৃহৎ রাষ্ট্র চতুষ্টয়ের মধ্যে বর্ত্তমানে এই ত্রিয়েস্ত নগরী একটি বড় বিরোধমূলক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে ইহা ছিল ইতালীর অন্তর্গত একটি সমৃদ্ধ বন্দর, শক্তিশালী বড় একটি নৌ-ঘাঁটি। কিন্তু যুদ্ধে ইতালীর ভাগ্য বিপর্য্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে যুগোশ্লাভিয়া ইহার উপর কর্ত্তৃত্ব দাবী করে।

এই বন্দরটি যার হাতে আসবে, আদ্রিয়াতিক উপসাগরের উপর তার কর্ত্তৃত্বই হবে সমধিক। তাই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভাবনায় পড়ে কেহই এই সহরের কর্ত্তৃত্ব ছাড়তে চায় না। বর্ত্তমানে যুগোশ্লাভিয়া রাশিয়ার প্রভাবাধীন হতে মুক্ত হয়ে পশ্চিমী শক্তিবর্গের প্রভাবাধীন হওয়ায় ত্রিয়েস্ত নিয়ে রাশিয়া একটি সমস্যায় পড়েছে। যতদিন যুগোশ্লাভিয়া রাশিয়ার প্রভাবাধীন ছিল, ততদিন যুগোশ্লাভিয়ার পক্ষ নিয়ে ত্রিয়েস্ত সম্বন্ধে রাশিয়ার কথা বলার যুক্তি ছিল প্রবল। কিন্তু দুইএর সম্পর্ক বর্ত্তমানে অহি-নকুলের পর্য্যায়ে আসায়, ত্রিয়েস্ত ইতালী বা যুগোশ্লাভিয়া যার ভাগ্যেই যাক, তার নিজের কোন সুবিধা নেই মনে করে রাশিয়া ত্রিয়েস্তকে এখন আন্তর্জ্জাতিক কর্ত্তৃত্বাধীনে রাখতে, অন্যথায় বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ ইতালীকেই প্রত্যর্পণে সমুৎসুক বেশী।

বর্ত্তমানে এই সহরটি দুইটি ভাগে বিভক্ত আছে। এক অংশ যুগোশ্লাভিয়া শাসন করে, অন্য অংশ রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিযুক্ত একটি যুক্ত কমিশন দ্বারা শাসিত হয়। ইতালীর মনস্তুষ্টির জন্য যে

এ্যাংগ্লো আমেরিকাও ইহাকে ইতালীর অন্তর্ভুক্তির পক্ষপাতী, তাতে কোন সন্দেহ নেই, যদিও এই সহরের জনসংখ্যার এক বৃহৎ অংশ যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে উহার সংযুক্তি কামনা করে।

এই সহরটির যতটা গুরুত্ব বর্ত্তমানে দেখা যায়, তাহা মূলতঃ হয়েছে মুসোলিনীর আমলে ইতালীর অন্তর্ভুক্ত থাকায়। ইহার সমৃদ্ধির মূলে রয়েছে ইতালীয়দের প্রচেষ্টা। ব্যবসা বাণিজ্য, কলকারখানা বা শিক্ষা বিষয়ক প্রতিষ্ঠানসমূহের অধিকাংশই ইতালীয়দের দ্বারা পরিচালিত হয়। ইহার জন্য তাই ইতালীবাসীর মমত্ববোধ কিছুমাত্র কম নয়।

ত্রিয়েস্ত নগরীর অবস্থান অতি মনোরম। পাহাড় এবং সমুদ্র ইহাকে অপরূপ শোভায় সমৃদ্ধ করেছে। তদুপরি সুপরিসর মসৃণ রাস্তাঘাট আর নূতন ধরণের বাড়ীঘর তৈয়ারী করে মুসোলিনী ইহাকে সকলের নিকট করেছেন আকর্ষণীয়।

মুসোলিনীকে রাজনৈতিকগণ যেভাবেই চিত্রিত করুন, তিনি যে ইতালীর জন্য কি করেছেন, তা' সেদেশের লোককে জিজ্ঞেস ক'রে জানবার প্রয়োজন হয় না, ইতালী দেশের পথে প্রান্তরে, গিরিকন্দরে, সহরে ও গ্রামে তা' সুপ্রকাশ রয়েছে। তাই রাজনৈতিক মুসোলিনীর মৃত্যু ঘটে থাকলেও, তাঁর গঠনমূলক কার্য্যাবলীই তাঁকে করেছে অমরত্ব দান। আর, অন্য দিক থেকে দেখতে গেলেও, বহুযুগ বাদে ইতালীয়দের প্রাণবন্ত করে তুলেছিলেন ত তিনিই।

খাড়াই পথে সাইকেলে চলা বিশেষ কষ্টসাধ্য। সময়ে সময়ে পায়ে হেঁটে সাইকেল ঠেলে তুলতে হল। ফলে শ্রান্ত দেহ ক্রমে অবসন্ন হয়ে আসল। যখন নীচুর দিকে নামবার সুযোগ পেলাম, তখন স্বভাবতঃই আনন্দ হল অত্যধিক। পাহাড় থেকে সাইকেলে নামতে যতটা আরাম ও আনন্দ পাওয়া যায়, এমন আনন্দ ও আরাম অন্য ভাবে চলায় পাওয়া যায় না। অবশ্য বিপদের সম্ভাবনাও খানিকটা থাকে। বিপদ সম্বন্ধে সতর্ক থেকেও শেষ পর্য্যন্ত এমন বিপদেই পড়লাম যে আরাম ভোগ আমার বেরিয়ে গেল, প্রাণ নিয়েই হল টানাটানি।

রাস্তায় আলগা একটা বড় পাথরে রাত্রির অন্ধকারে হঠাৎ এক ধাক্কা খেয়ে সাইকেল থেকে ছিটকে পড়লাম যেদিকে বিপদ বেশী সেই খাতের দিকেই। অতল সেই গহ্বরে পড়তে গিয়ে প্রাণের টানে যা' কিছু ধরলাম, তা' শুদ্ধ আমার সঙ্গে গড়াতে লাগল। হাত পঁচিশ ত্রিশ এমনভাবে গড়াতে গড়াতে শেষে একটি ছোট গাছ ধরে ফেললাম। এইভাবে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে আমি রক্ষা পেলাম। কিন্তু রক্ষা পেলেও উপরে উঠবার সাহস আর পেলাম না। এক কারণ—অন্ধকার, দ্বিতীয় কারণ—দেহের অবসন্নতা, তৃতীয় কারণ—খাড়া পাহাড়। তৃতীয় কারণটির জন্যই নূতন চেষ্টায় কোন আগ্রহ হল না, পাছে আবার পিছলে গিয়ে বিপদে পড়ি!

আর অমনভাবে থেকেও যে শেষ পর্য্যন্ত আমার কোন লাভ নেই, তা'ও বুঝতে আমার কষ্ট হল না। বরং উঠে

আসার চেষ্টা করাই যে আমার দরকার—তা সহজ বুদ্ধিতেই বুঝলাম। কিন্তু ঘন অন্ধকারে কোথায় কোন্ আলগা পাথরে পা দিতে গিয়ে আবার বিপদ ঘটাব, এমন আশঙ্কা মনে উপস্থিত হতেই নিরুৎসাহ হলাম। লোকে কথায় বলে—“চুণ খেয়ে যে মুখ একবার পোড়ে, দৈ দেখলেও তার ভয়।” আমার অবস্থাও হল প্রায় তদরূপ। তাই ঐভাবে কিছুক্ষণ অপেক্ষা ও বিশ্রাম করাই যুক্তিযুক্ত মনে করলাম। ফল তা'তে ভালই হল। ঐ পথে একটি মোটর আসতে দেখে আমি চীৎকার ক'রে সাহায্য চাইলাম। মোটরটি নিকটবর্ত্তী হতেই আমার হাঁক শুনে থামল। তারপর বিপদ বুঝে আরোহিগণ মোটর থেকে নামলেন। একজন একটি টর্চ্চের আলো ফেলে আমাকে লক্ষ্য ক'রে কি সব জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু আমার উত্তর তাঁরা কেউ বুঝলেন বলে মনে হল না। কারণ পরমুহূর্ত্তেই ফরাসী ভাষায় একজন আমাকে প্রশ্ন করলেন, কিন্তু আমি কিছু না বুঝেই উত্তর করলাম—“একজন ভারতবাসী আমি, জাগ্রেব যাব। পথে এই বিপদ। একটু সাহায্য করেন ত উপকৃত হই।” কিন্তু কোন কথাই তাঁদের বোধগম্য হল না। তাঁরা এবার ইতালীয় ভাষায় আমাকে কি কি জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু বলা বাহুল্য কা'রও কথা কেউ বুঝলাম না। তাঁরা আলো ফেল্‌লে আমি উঠতে চেষ্টা করলাম, খানিকটা উঠলামও। কিন্তু আবার চেষ্টা করবার পূর্ব্বেই আকারে ইঙ্গিতে তাঁরা আমাকে নিষেধ করলেন। পর

মুহূর্ত্তেই একজন একটি দড়ি এনে এক মাথা আমার নিকট ছুঁড়ে ফেললেন। এখন আর তেমন কোন অসুবিধা হল না। ভয়ের কোন আশঙ্কা না ক'রে দড়ি ধরে উঠে আসলাম।

তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমার অন্তর প্লাবিত হল, কিন্তু ভাষায় তা' প্রকাশ করা হল আমারই পক্ষে অসাধ্য। তাঁরা আমাকে তাঁদের মোটরে তুলে নিয়ে জাগ্রেবে এসে একটি হোটেলে আমার থাকার বন্দোবস্ত ক'রে আমার কাছ থেকে সেই রাত্রিতেই বিদায় নিলেন। আকারে ইঙ্গিতে তাঁদের পরিচয় জানতে প্রয়াস পেলাম, কিন্তু একটি সংক্ষিপ্ত উত্তর ছাড়া তাঁরা আর কিছু প্রকাশ করলেন না। সেই সংক্ষিপ্ত উত্তরটি হল এই—"বন্ধুজন"।

বিদেশ বিভুঁয়ে এমন সহানুভূতি ও সহৃদয়তা না পেলে কারও পক্ষে চলাই হয় দুষ্কর। আবার বিরুদ্ধ প্রকৃতির লোকও যে এসব দেশে একেবারেই বিরল, তা' ভাবলেও ভুল করা হয়। পরিপাটি পোষাক পরিহিত, বাক্‌চতুর অনেক চোর জুয়াচোরও আছে।

জাগ্রেব সহরের যে হোটেলটিতে ছিলাম, সেখানেই ছিল একজন ইংরেজী জানা লোক। পরদিন তার সঙ্গে আমার আলাপ হয়। স্থানীয় বা ইতালীয় বা ফরাসী ভাষার অজ্ঞতা হেতু যেখানে আমার সঙ্গে কথা বলার মত লোক ছিল না কেউ, সেখানে ইংরেজী জানা একজনকে পেয়ে আমার

মনটা কতই না হল প্রফুল্ল: সে ছিলও খুব মিশুক। তাই অল্প সময়ের মধ্যেই তার সঙ্গে আমার ভাব হল খুব। এই জন্যই তাকে আমার ঘরে একা রেখেও সময়ে সময়ে প্রয়োজনমত আমি বাইরে যেতাম। আর এমনই এক স্বর্ণ সুযোগে আমাকে সে করল বিশ্বাসঘাতকতা। মূল্যবান আমার ক্যামেরা ও হাতঘড়িটি নিয়ে সে হল নিরুদ্দেশ।

জাগ্রেব সহরটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত। দূর থেকে দেখতে ইহা খুবই সুন্দর। তাই খুব উঁচু ধারণা নিয়েই দর্শকগণ এই সহরে প্রবেশ করে, কিন্তু এখানে পৌঁছে অনেকেই হয় বিক্ষুব্ধ, আর বেশী বিক্ষুব্ধ হয় তারা যারা ইতালী থেকে এখানে আসে। কারণ মুসোলিনীর ইতালীতে নগর ও পল্লী যে রূপান্তর লাভ করেছিল, নূতন ধরণের বাড়ীঘর, পরিষ্কার ও মসৃণ রাস্তাঘাটে ইতালীর জনপদগুলি যেরূপ শ্রীমণ্ডিত হয়েছিল, তা' থেকে যুগোশ্লাভিয়া ছিল অনেকটা বঞ্চিত। তাই ত ইতালী ছেড়ে যুগোশ্লাভিয়ায় পদার্পণ করতেই কেবল মনে হয়েছে—একটি অনগ্রসর দেশে এসে পৌঁছলাম।

যে সহরটির কথা আমি বলছি, সেই জাগ্রেব সহরটি যুগোশ্লাভিয়া দেশের কেবল যে দ্বিতীয় বড় সহর, তা নয়। ইহা ক্রোশিয়া প্রদেশের রাজধানী। আর এই সহরটি থেকে ক্রোট জাতির স্বাতন্ত্র্যের দাবী বার বার ঘোষিত হয়েছে, অর্থাৎ এই সহরটিই ক্রোটগণের প্রাণকেন্দ্র, তাদের সকল কর্ম্মোদ্যমের কেন্দ্রস্থল।

বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে যখন জার্ম্মানী যুগোশ্লাভিয়া দেশটি আক্রমণ ক'রে ইহার রাজধানী বেলগ্রেড ও অন্যান্য সহর বোমাবর্ষণে ধ্বংস করেছিল, তখনও কিন্তু এই জাগ্রেব সহরটি হিটলারের ক্রোধবহ্নি থেকে রক্ষা পেয়েছিল। অবশ্য এই রক্ষা পাওয়ার বিশেষ কারণও ছিল। কারণ ছিল এই যে অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মত হিটলারও যুগোশ্লাভিয়া দেশের আভ্যন্তরীণ কলহের সুযোগ গ্রহণ ক'রে ক্রোটগণের বহু আকাঙ্খিত স্বতন্ত্রের দাবীকে স্বীকার ক'রে নিয়ে তাদের আনুগত্য লাভ করেছিলেন। তাই দেখা গেল যুগোশ্লাভিয়ার একাংশ বোমাবর্ষণে বিধ্বস্ত হল, অন্য অংশ ধ্বংস থেকে রইল মুক্ত।

১৯১৮ সনে বর্ত্তমান যুগোশ্লাভিয়া দেশটি যখন গঠিত হয়, তখন বহুরকম ভাষাভাষী লোক ইহার অন্তর্ভুক্ত হল, অর্থাৎ আভ্যন্তরীন কলহের বীজ উপ্ত হল। যুগোশ্লাভিয়ার আয়তন হয়েছে পঁচানব্বই হাজার বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষের মত। এই লোক সংখ্যায় রয়েছে সত্তর লক্ষ সার্ব্ব, চল্লিশ লক্ষের উপর ক্রোট, দশ লক্ষের বেশী শ্লোভেন, ছয় লক্ষ হাঙ্গেরীয়, তিন লক্ষ জার্ম্মান এবং আরও বিভিন্ন জাতির কয়েক লক্ষ লোক।

তা' ছাড়া আরও অনেক ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ও রয়েছে। যদিও সংখ্যায় তারা অনেক নয়, তথাপি তাদের ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রয়েছে। তদুপরি আছে ঐ হাঙ্গেরীয়, রুমানীয়

এবং জার্ম্মান সংখ্যালঘিষ্ঠগণ। সংখ্যায় তারা তত বেশী না হলেও গণ্ডগোল সৃষ্টি করবার ক্ষমতা তাদের যথেষ্টই আছে। বিশেষতঃ সীমান্ত পারের রাষ্ট্রসমূহের লোকজন যখন তাদের জ্ঞাতিগোষ্ঠি।

উপরের ঐ লোকসংখ্যা থেকে দেখা যায় যে যুগোশ্লাভিয়ার প্রধান তিনটি সম্প্রদায় হয়েছে—সার্ব্ব, ক্রোট ও শ্লোভেন। ক্রোটগণ দেশের অন্যান্যদের অপেক্ষা বেশী উন্নত। এই ক্রোট গণের বাসভূমি ক্রোশিয়া প্রদেশ প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে ছিল অষ্ট্রিয়ার অধীনে স্বায়ত্বশাসিত একটি প্রদেশ। তাই শিক্ষায় বা অর্থনৈতিক বিষয়ে ছিল ক্রোটগণ বেশী উন্নত, কিন্তু তবুও রাজনৈতিক পরাধীনতা ছিল তাদের অসহ্য। এজন্যই প্রথম মহাযুদ্ধে অষ্ট্রিয়া ও জার্ম্মানীর পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রোশিয়া প্রদেশ পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্ত হয়ে যখন অন্যান্য শ্লাভ অধ্যুষিত অঞ্চলের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যুগোশ্লাভিয়া দেশের সৃষ্টি করল, তখন সকলেই হল উৎফুল্ল। কিন্তু যে আশা ও আনন্দ নিয়ে ক্রোটগণ অন্যান্য জাতি ভাই-এর সঙ্গে মিলিত হল, তা বেশী দিন স্থায়ী হল না। কারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ সার্ব্বগণ জাতীয়তার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বিভিন্ন জাতির সমবায়ে যে একটি মহাজাতির সৃষ্টি করতে প্রয়াস পেল, তা'তে ক্রোটগণ আত্মস্বাতন্ত্র্য লোপ পাওয়ার সম্ভাবনা দেখে অচিরেই হল বিক্ষুব্ধ। যুগোশ্লাভিয়ার অন্তর্ভুক্ত থেকে ক্রোটগণের স্বায়ত্ব শাসন ভোগের ইচ্ছা সফল হল না। তাই এই দাবীতে সার্ব্ব ও

ক্রোটগণের মধ্যে হল মতান্তর। সেই মতান্তরের পরিণতি ঘটল মনান্তরে। অবশেষে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে ১৯৩৯ সনে ক্রোটগণের স্বায়ত্তশাসনাধিকারের দাবী স্বীকৃত হল, কিন্তু পরস্পরের মনান্তর দূর হতে দেরী হল। এই আভ্যন্তরীন মনান্তর ও কলহের সুযোগ জার্ম্মানী বিগত মহাযুদ্ধে পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করেছিল।

ক্রোট ও সার্ব্ব—উভয়েরই ভাষা ও ধর্ম্ম এক। উভয়ের একটি কথ্য ভাষা হলেও লিখতে গিয়ে দু'জনে ব্যবহার করে দুরকমের লিপি। ক্রোটরা করে রোমান অক্ষর ব্যবহার, আর সার্ব্বরা করে তাদের পুরানো লিপি ব্যবহার। ধর্ম্মে উভয়েই খৃষ্টান, কিন্তু ক্রোটরা অধিকাংশই ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত, আর সার্ব্বরা অর্থডক্স সম্প্রদায়ভুক্ত। তা' ছাড়া, ক্রোটরা প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে অষ্ট্রোহাঙ্গেরীর অধীনে থাকায় সার্ব্বদের অপেক্ষা সকল বিষয়েই বেশী উন্নত ছিল এবং এখনও বেশী উন্নত। সেইজন্য অন্যান্যদের তুলনায় ক্রোটদের আত্মাভিমানও বেশী।

প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে ইউরোপে ফ্রান্সের প্রভাবই ছিল বেশী। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে জার্ম্মানী ও ইতালীর পুনরভ্যু-ত্থানের পূর্ব্ব পর্য্যন্তও অর্থাৎ ১৯৩৩ সন পর্য্যন্ত ইউরোপের দেশে দেশে ফ্রান্সের প্রভাব তেমন উল্লেখযোগ্য হ্রাস পায় নাই। তাই যুগোশ্লাভিয়ায়ও ফ্রান্সের প্রভাব যথেষ্টই ছিল। দেশের ব্যবসা বাণিজ্য, বিশেষতঃ খনিজশিল্পে ইংরাজেরও হাত ছিল

বেশ। তাই এই দেশের জনগণের উপর ফরাসীর তুলনায় ইংরাজের প্রভাব উল্লেখযোগ্য না হলেও নেতৃবৃন্দের উপর বিশেষভাবেই ছিল, বিশেষতঃ দেশের রাজা ছিলেন ইংরাজের বিশেষ অনুরাগী বন্ধু। ইংরাজ, আমেরিকা ও ফরাসীর প্রভাবে প্রথম মহাযুদ্ধের পরে যেভাবে এই দেশটি গঠিত হল, তাতে রাজা আলেকজেন্দার ও তৎপরবর্ত্তী রিজেন্ট পল তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞই ছিলেন এবং রাজ্যের বৈদেশিক নীতি ঐভাবে পরিচালিতও হত। কিন্তু গোল বাধিল—একদিকে যখন ইতালী ও জার্ম্মানী ক্রমেই বেশী শক্তিশালী হয়ে উঠল, অন্যদিকে রাশিয়াও এক মহাশক্তিতে পরিণত হতে লাগল। সুতরাং ইউরোপের অন্যান্য অনেক দেশের মত যুগোশ্লাভিয়াও উহাদের প্রভাব হতে মুক্ত থাকতে পারল না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে এই দেশের অবস্থা জটিল হয়েই রইল। একদিকে আভ্যন্তরীন কলহ, অন্যদিকে বিভিন্ন বিরুদ্ধ শক্তির প্রভাব। এই দুই-এর চাপে এই দেশ মহাযুদ্ধ আরম্ভ হলে "নিরপেক্ষ" ঘোষণা করল, কিন্তু যুদ্ধের গতি পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই দেশের নীতিও পরিবর্ত্তীত হতে লাগল। অক্ষশক্তির বিপুল শক্তি দেখে, আগামী দিনের কথা ভেবে যুগোশ্লাভিয়া আত্মরক্ষার জন্য ক্রমেই রাশিয়ার দিকে ঝুকল। ফলে অক্ষশক্তিও যুগোশ্লাভিয়ার প্রতি বিশ্বাস হারাল। তারপর সত্যই একদিন জার্ম্মানী ও ইতালী কর্ত্তৃক এই দেশ আক্রান্ত ও বিজিত হইল। কিন্তু

দেশের পরাধীনতা সকল দলের পক্ষেই হল অসহ্য। তাই স্বাধীনতার জন্য দেশের জনগণ আবার ঐক্যবদ্ধ হল এবং প্রথম আক্রমণকারী অক্ষশক্তিকে পর্য্যুদস্ত করবার জন্য দেশের জনগণ রুশ সৈন্যকে করল সাদর অভ্যর্থনা এবং তাদের সঙ্গে করল সক্রিয় সহযোগিতা। এই সময়েই প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রধান নেতা মার্শাল টিটো বিশেষ পরিচিতি লাভ করেন এবং রাশিয়ার নিকটও তাঁহার সম্মান যথেষ্ট বৃদ্ধি পেল।

এই দেশে জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যে দলের (কমিউনিষ্ট পার্টি) নেতৃত্বেই প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠুক না কেন, ইহা ছিল বিশুদ্ধ 'স্বাধীনতার আন্দোলন'। যে মনোভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে জনগণ প্রতিরোধ আন্দোলন চালিয়ে ছিল, ঠিক সেই মনোভাবের বশবর্ত্তী হয়েই প্রতিরোধ আন্দোলনের নেতা এবং বর্ত্তমান গভর্ণমেন্টের পরিচালক মার্শাল টিটো যুদ্ধের পরবর্ত্তীকালে রুশদেশের দাস সুলভ আনুগত্য স্বীকার করতে পারেন নাই, যেজন্য বর্ত্তমানে দুই দেশের মধ্যে মনোমালিন্য প্রকাশ্য শত্রুতায় পরিণত হয়েছে।

যুগোশ্লাভিয়ার চতুষ্পার্শ্বে রাশিয়ার প্রভাবাধীন যে সকল রাষ্ট্র রয়েছে, যেমন হাঙ্গেরী, রুমানিয়া এবং বুলগেরিয়া, তাহারাও প্রতিবেশী রাষ্ট্র যুগোশ্লাভিয়ার প্রতি বিরুদ্ধাচরণ আরম্ভ করল। এই অবস্থায় জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার্থে মার্শাল টিটো ক্রমেই এ্যাংগ্লো আমেরিকার পক্ষপুটে আশ্রয় নিতে বাধ্য

হলেন। সুতরাং এই অঞ্চলে একটি গোলমেলে অবস্থা সৃষ্টি হল। রাশিয়ার ঘরের দরজায় ইতালী, যুগোশ্লাভিয়া, গ্রীস এবং তুরস্কের ঐক্যবদ্ধ একটি শক্তিগোষ্ঠি এ্যাংগ্লো আমেরিকার প্রকাশ্য সাহায্য এবং সমর্থনে ক্রমেই শক্তিশালী হবার অবকাশ পেল। এইজন্যই ত রাশিয়া এবং তার মিত্র রাষ্ট্রসমূহ যুগোশ্লাভিয়ার মত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র একটি শক্তিকে শত্রু জ্ঞান করেও ইহাকে ধ্বংস করতে সাহসী হল না, এবং তা সম্ভব হল না আর একটি মহাযুদ্ধের ঝুঁকি নিতে রাশিয়া এখনও প্রস্তুত নয় বলেই।

যুগোশ্লাভিয়ার নিয়মিত সৈন্যবল পাঁচ লক্ষের মত, অনিয়মিত সৈন্য সংখ্যা ধরলে পনেরো লক্ষ হবে। সুতরাং যে হঠকারিতার জন্য রাশিয়া এইরূপ একটি বন্ধুরাষ্ট্র হারাল, তার ফল আগামী যুদ্ধে তার পক্ষে মোটেই শুভ হবে বলে মনে হয় না। অবশ্য যুগোশ্লাভিয়া প্রধান যুদ্ধাঞ্চলে পরিণত হলে যে তারও ধ্বংস ছাড়া কোন কল্যাণ নেই, তাও নিশ্চিত।

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে ক্রোশিয়া প্রদেশ অষ্ট্রো হাঙ্গেরীর অধীনে থাকায় এবং ইতালীর সংলগ্ন থাকায় আধুনিক ইউরোপীয় রাষ্ট্র সমূহের অর্থাৎ ইতালী, জার্মানী ও ফ্রান্সের প্রভাবে অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা এই প্রদেশ প্রায় সকল বিষয়েই বেশী অগ্রসর ছিল। প্রদেশের রাজধানী ঐ জাগ্রেব সহরেও তা' সুস্পষ্ট প্রকাশ রয়েছে, প্রকাশ রয়েছে

তার রাস্তাঘাটে এবং বড় বড় পাঁচ সাত তলা বাড়ীঘরে। সহরের পাশেই যে পাহাড় (Kaptol Hill), সেই পাহাড়ের উপর হতে সহরটিকে বড়ই সুন্দর দেখায়। এখানে দ্বাদশ শতাব্দীতে তৈয়ারী সুন্দর একটি গির্জ্জা রয়েছে। এই পাহাড়ের পাদদেশ দিয়া শহরের যে রাস্তাটি রয়েছে, উহাই শহরের প্রধান ব্যবসা কেন্দ্র। এই শহরে প্রায় প্রতি বৎসরই মেলা হয়। সেই সময়ে বহু রকমের পণ্যসম্ভার এবং বহু দেশের জন সমাগমে সহরটির রূপ পরিবর্ত্তন হয়ে যায়।

জাগ্রেব সহরটি একটি বড় শিক্ষাকেন্দ্রও বটে। এখানকার দর্শনযোগ্য স্থানগুলির মধ্যে প্রথমেই বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীটির নাম মনে আসে। এই লাইব্রেরীটিতে প্রায় ৩লক্ষ নূতন ও পুরানো বই রয়েছে।

এই জাগ্রেব সহরে আসার পথে আর একটি যে প্রধান সহর পড়ে, তার নাম লুবলানা। শ্লোভেন জাতি অধ্যুষিত প্রদেশের উহা রাজধানী। এখানে প্রায় ৮০ হাজার লোকের বাস। ইতালীর সংলগ্ন বলে ইহার উপর স্বভাবতঃই ইতালীয় প্রভাব বেশী। এই প্রদেশে পাহাড় অনেক। এখানে প্রচুর আঙ্গুর এবং মদ তৈয়ারী হয়। পাহাড় থাকায় এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য বেশ সুন্দর।

সহরটিতে যে ছোট্ট একটি পাহাড়, তার উপরে রয়েছে পুরাতন একটি দুর্গ। ইহা তৈয়ারী হয়েছিল ১৫শ শতাব্দীতে।

সুতরাং সহরটি যে বেশ প্রাচীন, তা' না বললেও চলে। তাই বলে সহরের বাড়ীঘর সকলই যে সে-যুগের, তা' নয়। এখানে সুন্দর সুন্দর বহু আধুনিক বাড়ীঘর রয়েছে, হোটেল, রেস্তর**াঁ**রও অভাব নেই।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের দিক থেকে যুগোশ্লাভিয়া দেশটিকে যে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়, তন্মধ্যে এই শ্লোভেনিয়া, ক্রোশিয়া, সার্ব্বিয়া, আড্রিয়াতিক উপকূল (ডালমেটিয়া) অঞ্চলগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্লোভেনের পাহাড় বনে জঙ্গলে পূর্ণ। তা'ছাড়া এখানে ওখানে হ্রদ এবং জলপ্রপাত থাকায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে এই অঞ্চল সমৃদ্ধ। শিকারীদের নিকটও এই অঞ্চল বিশেষ আকর্ষণীয়। এখানকার আবহাওয়া অপেক্ষাকৃত একটু বেশী ঠাণ্ডা। তাই শীতকাল অপেক্ষা গ্রীষ্মকালেই এখানে ভ্রমণে আরাম বেশী।

জাগ্রেব যেতে পথে যে বিপদে পড়েছিলাম, তার ফলে শরীরে ব্যথা বেদনা হয়েছিল বেশ। তা'ও দিন কয়েকের মধ্যেই সেরে গেল বটে, কিন্তু পায়ে এবং কোমরে যে চোট পেয়েছিলাম, তার ফলে সাইকেলে চড়ে বেড়াবার মত অবস্থা ফিরিয়ে পেতে আমার আরও যে বেশ কিছুদিন লাগবে, তা' বুঝলাম। কিন্তু এতটা সময় একটি জায়গায় থাকা আমার পক্ষে ছিল নানা কারণেই অসম্ভব। তাই এইবার যুগোশ্লাভিয়ার

বাকী অংশ ভ্রমণ করতে আমাকে ট্রেণেরই আশ্রয় নিতে হল।

ট্রেণে এবার দেশের সমুদ্র পারের সৌন্দর্য্য উপভোগে রওনা হলাম। প্রথমেই গেলাম স্প্লিট।

আড্রিয়াতিক উপসাগরের পারে স্প্লিট একটি বন্দর। ইহাই এই দেশের সর্ব্বপ্রধান বন্দর। দূর হতেই এই বন্দরের সুউচ্চ পুরাতন একটি প্রাসাদের চূড়া আগন্তুকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই বাড়ীটি তৈয়ারী হয়েছিল ৩০৫ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ আজ হতে প্রায় ১৬৫০ বৎসর পূর্ব্বে। ইহার আঙ্গিনায় বর্ত্তমানে যে নূতন বসতি গড়ে উঠেছে, তার লোক সংখ্যা প্রায় তিন হাজার। এই সহরে যে সকল দ্রষ্টব্য স্থান রয়েছে, তন্মধ্যে রাজপ্রাসাদ, জুপিটারের মন্দির, চিত্রশিল্পের প্রদর্শনী এবং যাহুঘর বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সহর মিউজিয়ামটিতে এই অঞ্চলের শিল্পীদের হস্তনির্ম্মিত সুন্দর সুন্দর শিল্পকার্য্য সংরক্ষিত রয়েছে। তা' দেখে এখানকার শিল্পকলা এবং শিল্পীদের নৈপুণ্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট একটা ধারণা জন্মে।

যুগোশ্লাভিয়ার এই আড্রিয়াতিক উপকূল বড়ই সুন্দর। সুরম্য বৃক্ষরাজিসমন্বিত পাহাড়, মাঝে মাঝে আধুনিক সহর, আর নীল সাগরের বক্ষে এখানে ওখানে ছোট ছোট দ্বীপ, সূর্য্য কিরণে উদ্ভাসিত বেলাভূমি, আর ঐ ফেনিল ঢেউ, সমুদ্র স্নানের ঘাটে ঘাটে স্বল্প পোষাক পরিহিত অসংখ্য স্নানার্থীর হাস্য কলরবে এক অপূর্ব্ব আনন্দদায়ক দৃশ্যের সৃষ্টি হয়।

পেছনে সবুজ পাহাড়, সামনে ঐ বৃহৎ উর্ম্মিমালা, উপরে ঐ নীল আকাশে শাদা পাখীর ঝাঁক, আর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রঙিন মেঘ, তদুপরি সমুদ্রে ঐ সূর্য্যাস্তের দৃশ্য দর্শকের মনে এক স্বপ্নাবেশ সৃষ্টি করে।

আদ্রিয়াতিক উপপকূল সত্যই তো সুন্দর! এখানে কোনটারই 'অতিশয়' নেই। এখানে ইউরোপের বরফপড়া শীত সেই কনকনে শীত নেই, আবার গ্রীষ্মের সেই অসহ্য গরমও হয় না, বাংলার মত অঝোর ধারায় এখানে বর্ষাও নামে না। সুতরাং আবহাওয়া সকল সময়ে উপভোগ্যই থাকে।

দেশের এই উপকূল ভাগ বিদেশীর নিকট আরও একটি কারণে উপভোগ্য হয়। সেই কারণটি আর কিছু নয়, এই দেশের জনগণের সাজসজ্জার বৈচিত্র্য। ইতালী, ফ্রান্স, জার্ম্মানী, ব্রিটেন প্রভৃতি প্রধান প্রধান পশ্চিমী রাষ্ট্রে জনগণের সাজসজ্জায়, চালচলনে, আদবকায়দায় যে একঘেয়ে দৃশ্য সৃষ্টি হয়, যা দেখে আমার মত বিদেশীর চোখও হয় ক্লান্ত, যে পীড়াদায়ক এক ঘেয়ে দৃশ্য থেকে মন চায় একটু মুক্তি, সেই মুক্তিজনিত আনন্দই পাওয়া যায় যুগোশ্লাভিয়ার এই উপকূল ভাগে। সেখানে পাহাড়ীয়দের বিচিত্র পোষাক আর অনাড়ম্বর আচরণ বিদেশীকে দেয় আনন্দ, দেয় তৃপ্তি।

এই অঞ্চলের পার্ব্বত্য অধিবাসীদের নৃত্যগীত বেশী উপভোগ করা যায় সিঞ্জ (Sinj) নামক ক্ষুদ্র সহরটিতে। স্প্লিট থেকে

অল্প দূরে এই যায়গায় প্রতি বৎসর কয়েকটি দিনে, যেমন ২৩শে এপ্রিল এবং ১৪, ১৫ ও ১৭ই আগষ্ট তারিখে, বিশেষতঃ ঐ ১৭ই আগষ্ট নাচ গান আনন্দ উৎসবের হিল্লোড় ওঠে। ঐ সময়ে দলে দলে চারিপাশের লোক নানা জাতীয় সাজ সজ্জায় সজ্জিত হয়ে এখানে সমবেত হয় উৎসবের আনন্দে যোগদান করতে। ঐ দিন আলকারি নামক পার্ব্বত্য অধিবাসিরা ঘোড়দৌড়ে বিজয়সূচক নির্দ্দিষ্ট পুরস্কার লাভের জন্য এসে সমবেত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে তারা যে তুর্কীদের পরাজিত করেছিল, ইহা সেই স্মারক উৎসব। এই উৎসবে অধিবাসিগণ শুধু আনন্দই উপভোগ করে না, নূতন উৎসাহ, নূতন কর্ম্মোদ্দী-পনায়ও হয় তারা অনুপ্রাণিত। আর বিদেশী দর্শকরা তাদের বিচিত্র বেশভূষা এবং জাতীয় উৎসবের নৃত্যগীতে পরম আনন্দ উপভোগ করে।

আদ্রিয়াতিক উপকূলে ডুব্রভ্‌নিক নামক ছোট্ট সহরটিও বিখ্যাত। ইহা প্রাচীর ঘেরা একটি অতি পুরাতন সহর। এখানে এসে বিগত শতাব্দীর বহু ঘটনাই স্মৃতিপথে উদিত হয়। অবশ্য তা' মনে প'ড়ে আমার মত একজন দূর বিদেশের পর্য্যটকের মনোভাবে তেমন আলোড়ন সৃষ্টি না হলেও এই দেশেরই যে কোন একজন দর্শকের মনে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়, কত সুখস্মৃতি মনে ক'রে তাদের হর্ষোৎফুল্ল মনে বিস্ময় সৃষ্টি হয়, আবার বিয়োগান্ত কোন ঘটনার মতই দেশের অধঃপতনের কাহিনী মনে পড়েও দুঃখভারক্রান্ত না হয়ে তারা

পারে না। এইরূপ বিগত কাহিনী থেকে দেশের বৃহত্তর এবং সুন্দরতর ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবার জন্যও যে তাদের মন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়, সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই।

এখানে বহু বিদেশী পর্য্যটকের আগমন হয়। ভালভাবে থাকা ও খাওয়ার বন্দোবস্ত এখানকার হোটেল রেস্তরাঁগুলিতে রয়েছে, যেমন রয়েছে অন্যত্র।

ইউরোপের অন্যত্র যেমন, এই দেশেও তেমনই দেশী ভাষা না জানায় অসুবিধা ভোগ করতে হয় অনেক। বিদেশী ভাষাগুলির মধ্যে ফরাসী ভাষার কদরই এখানে বেশী। প্রায় প্রত্যেক শিক্ষিত লোকই ফরাসী বলতে পারেন। ইতালীয় এবং জার্ম্মান ভাষাও অনেকে জানেন। কিন্তু ইংরাজী জানা লোকের সংখ্যা খুবই কম। যারা জানেন, তাদের খুঁজে বার করাই একটি সমস্যা। আমাদের দেশে যেমন বিলাতে গিয়া শিক্ষালাভের একটি বিশেষ মর্য্যাদা ও ঝোঁক আছে, বল্কান অঞ্চলের দেশগুলিতেও তেমনই ফরাসী দেশের শিক্ষা এবং ডিগ্রির মর্য্যাদা অনেক বেশী। তাই সঙ্গতি থাকলে এখানকার ছেলেমেয়েরা সাধারণতঃ ফরাসী দেশে শিক্ষার জন্য যায়।

ইংরাজী ভিন্ন অন্য ভাষার অজ্ঞতা হেতু আমাকে এই অঞ্চলে খুবই অসুবিধা ভোগ করতে হত। মুখ বুজেই বেশী সময় থাকতে হত অথবা উৎসুক জনগণের সঙ্গে ভগবান প্রদত্ত সেই সহজ এবং বোধগম্য ভাষায় অর্থাৎ ইসারায়ই ভাবের

বিনিময় করতে হত। অসুবিধাজনক এবং সময় সময় বিরক্তিকর মনে হলেও অনেক সময় ইহাতে অনেক হাস্যরসেরও সৃষ্টি হত।

সমুদ্রের উপকূল ভাগ হতে উপরের দিকে দেশের একটু অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেই একটি জিনিষ চোখে পড়ে। তা' ইউরোপের মাটিতে ইসলামের প্রভাব। সযত্নে আবরু রক্ষার জন্য মুসলমান নারীর আপাদমস্তক বোরখা পরিধান, মসজিদে মসজিদে নামাজের হাঁক, হুকায় তামাক সেবন—এ সকলই সহরে ও গ্রামে চোখে পড়ে। আরও চোখে পড়ে মুসলমান আধুনিকা নারীরা কিভাবে মুখের উপরে 'জালি' ব্যবহার ক'রে একদিকে পূর্ব্ব পুরুষের প্রথা বজায় রাখে, অন্য দিকে নূতন পৃথিবীর নূতন আলো হাওয়া সকলের মতই সমানভাবে উপভোগ করে। ইহাতে তাদের আবরু রক্ষা যতটুকুই হোক, প্রথা রক্ষা হয় ঠিকই। মোস্তার, সরজেভো প্রভৃতি বোসনিয়া অঞ্চলের সহর ও গ্রামে এই মুসলিম প্রভাব চোখে পড়ে বেশী। সরজেভো এই অঞ্চলের রাজধানী। যে তুর্কী প্রভাব এখানে এতটা এখনও বর্ত্তমান, সেই তুরস্ক কিন্তু আর তেমন নাই। নব্য তুরস্কে নারীর পর্দাপ্রথা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

বোসনিয়া অঞ্চল ছেড়ে এবার রওনা হলাম দেশের রাজধানী বেলগ্রেড, অবশ্যই ট্রেণে। কারণ সাইকেলে পার্ব্বত্য অঞ্চল ভ্রমণ করবার মত সুস্থদেহ তখনও আমি লাভ

করিনি। রাত্রিতে ঘুমে চোখ বুজে আসলেও ঘুমোবার সুযোগ হল কম। প্রথম কারণ—অল্পক্ষণ পরে পরেই টিকিট পরীক্ষকদের কর্ম্মতৎপরতা। দ্বিতীয়তঃ—যাত্রীর ভীড়ে ঘুমোবার মত জায়গাও ছিল কম। অবশেষে বাধ্য হয়ে আমারই পাশের একজন সার্ব্ব যুবকের সঙ্গে ঘুমের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করে নিলাম। অপরিচিত বন্ধুটি আমার কোলে রাখল তার মাথা, আর আমি তার পিঠে মাথা রেখে নিদ্রাদেবীর আবাহন করলাম।

সকাল হতে না হতেই ট্রেণটি এসে বেলগ্রেড পৌঁছল। তুরস্ক হতে প্যারী পর্য্যন্ত যে আন্তর্জাতিক ট্রেণ যাতায়াত করে, সেই প্রধান রেলপথেরই এই বেলগ্রেড একটি বড় স্টেশন। এখান থেকে হাঙ্গেরী, রুমানিয়া প্রভৃতি দেশেও ট্রেণ যায়। তাই বলে বেলগ্রেডকে যত বড় স্টেশন মনে হয়, তত বড় উহা নয়। আমাদের হাওড়া স্টেশন অপেক্ষা উহা অনেক ছোট।

একই যায়গার নাম ইংরাজীতে আর দেশী ভাষায় যে সময় সময় অনেক তফাৎ হয়, আর তা যে হয় শুধু আমাদেরই দেশে, তা' নয়, ইউরোপের দেশে দেশেও হয়। স্থানীয় উচ্চারণ, অর্থ এবং ঐতিহাসিক গুরুত্ব বেমালুম ভুলে ইংরাজরা নিজেদের উচ্চারণের সুবিধাই বেশী দেখেছে, যেমন—আমরা বলি কলিকাতা, কিন্তু ইংরাজরা ইহাকে বিকৃত করে করেছে ক্যালকাটা, ক্যালকুট্টা। ইতালী দেশের ন্যাপ্‌ল্‌স্ (Naples)

একটি বিখ্যাত সহর। ইহাকে ইতালীয়গণ নেপোলি (Napoli) বলে। ইতালীয়গণ দেশের রাজধানীকে রোমা (Roma) বলে, কিন্তু ইংরাজরা ইহাকে করেছে রোম (Rome)। এইরূপ জেনোভা (Genova)কে ইংরাজরা করেছে জেনোয়া (Genoa)। এইভাবে যুগোশ্লাভিয়ার রাজধানী বিউগ্রেড (Beograd)কে ইংরাজরা করেছে বেলগ্রেড (Belgrade)। আমার এ বিষয়ে তেমন খেয়াল না থাকায় একদিন বেলগ্রেডের ট্রেণই ধরতে পারলাম না। কারণ আমি স্টেশনে অপেক্ষা করছিলাম বেলগ্রেড লেখা ট্রেণের জন্য, কিন্তু যে সকল ট্রেণ আসল, তাদের সকলগুলির উপরই লেখা দেখলাম বিউগ্রেড। সুতরাং ট্রেণ আর সেদিন ধরা হল না। তারপর যখন খোঁজ করে নিজের ভুল বুঝতে পারলাম, তখন আর বেলগ্রেডের কোন ট্রেণ ছিল না। সুতরাং ভুলের জন্য ভাল ক'রেই দণ্ড দিতে হল।

অতি প্রত্যুষেই বেলগ্রেড স্টেশনে এসে ট্রেণ থামল। নিজের মালপত্র সঙ্গে করে কোথায় আবার ঘুরব, মনে ক'রে ট্রেণ থেকে নেমেই গেলাম বিশ্রাম ঘরে। সেখানে জামাকাপড় ছেড়ে সুটকেশটি মালপত্র জমা রাখার অফিস ঘরে (cloak room) রেখে রাস্তায় বেরুলাম। স্টেশনের বাইরে এসেই একটি বড় কাফেতে ঢুকলাম। সেখানে প্রাতঃরাশ সেরে বেরুলাম একটি সস্তা হোটেলের খোঁজে। কিন্তু একটি একটি করে ছোট বড় অনেকগুলি হোটেলই ঘুরলাম, কিন্তু কোথাও আমার থাকবার

সুবিধা হল না। সর্ব্বত্রই শুনলাম একই বাণী—‘স্থানাভাব’। স্থানাভাব হওয়ার বোধ হয় কারণও ছিল। তখন এই সহরে আন্তর্জ্জাতিক একটি প্রদর্শনী চলছিল। সুতরাং বহু দেশের বহু লোক এই বেলগ্রেডে এসে ভীড় করেছিল। কেউ বা এসেছিল মেলার সুযোগে কিছু কেনা বেচা করতে, কেউ বা এসেছিল অপরিচিত দেশের নূতন নূতন জিনিষ দেখতে। আর কেউ কেউ বা এসেছিল নাচ গান হিল্লোড়ে যোগ দিয়ে একটু আনন্দ উপভোগ করতে। কিন্তু এখানে আমার আগমনের সঙ্গে ঐগুলির কোনটারই বিশেষ সম্পর্ক ছিল না, অথবা সত্য কথা বললে কেনা বেচা বাদে আর সকল কিছুর সঙ্গেই আমার খানিকটা যোগ ছিল। কিন্তু হোটেলের পর হোটেল ঘুরে যখন একই স্থানাভাবের বাণী শুনলাম, তখন আমার মনটি যে এই প্রদর্শনীর উপরই বিশেষ অপ্রসন্ন হল, এমন কথা বললে নিশ্চয়ই খুব ভুল বলা হবে না। ঘুরতে ঘুরতে যখন দেহ ক্লান্ত, আর ‘না’ শুনতে শুনতে যখন মন আর মেজাজ উভয়ই বিরক্তিতে পূর্ণ হয়ে উঠল, তখন একজন একটি বাড়ীর ঠিকানা দিয়ে সেখানে থাকার পরামর্শ দিলেন। উপকারী বন্ধুটিকে ধন্যবাদ দিয়ে সেই বাড়ীতে এসে জানলাম যে একটি ঘর সত্যই খালি আছে। কিন্তু ঘরের অবস্থা যা’ দেখলাম, তা’ না বলাই ভাল। তা’ ছাড়া ঘরের ভাড়াও অত্যধিক। সুতরাং এখানেও আমার আর থাকা হল না। কিন্তু তা’ হলেও বিধি আমার প্রতি বাম হলেন না। অদূরেই একটি বড় হোটেলে একখানি ঘর আমি

পেলাম। একটি শয্যা-বিশিষ্ট এই ঘরখানির দৈনিক ভাড়া দিতে হল পঞ্চাশ দিনার (২০০ দিনার=১৩৲। ১ দিনার= ১০০ সেণ্ট)। হোটেলটির বহির্দৃশ্য যেমন আকর্ষনীয়, ঘরগুলির অবস্থা তেমন আকর্ষনীয় ত নয়ই বরং নোংরা বললে মোটেই অত্যুক্তি করা হবে না। ইউরোপে কোন দেশেও এইরূপ নোংরা হোটেল থাকতে পারে, তা' না দেখলে বিশ্বাস করাই মুস্কিল। হোটেলটির পায়খানাগুলির অবস্থা দেখলে অন্নপ্রাসনের অন্নও উঠে আসে।

কা'রা কতটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, আমার মতে তা' জানবার একটা সহজ উপায় আছে। পরিপাটি পোষাক পরিচ্ছদ বা আদব কায়দা, চালচলন দেখে কারও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে বুঝতে চেষ্টা করলে মারাত্মক ভুল করা হয়, জানতে হয় বাড়ীর অন্দরমহলের ঐ রান্নাঘর আর পায়খানা একবার পরিদর্শন ক'রে।

যুগোশ্লাভিয়ার বৃহদংশ ভ্রমণ ক'রে এবং অসংখ্য লোকের সান্নিধ্য লাভ ক'রে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তা' থেকে আমার মনে হয় যে এই বল্কান অঞ্চলের লোকজন ইউরোপের অন্যান্যদের তুলনায় অনেক বেশী অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন। আমার এই কথার সত্যতা ঐ দেশগুলির যে কোন জায়গার হোটেলে রস্তেরাঁয় বা বাড়ীঘরে একবার উঁকি মারলেই বুঝা যাবে। এদের সঙ্গে অন্যান্য ইউরোপীয়দের কোন তুলনা করাই কঠিন। এদের চালচলন, বিভিন্ন রকমের বেশভূষা, আচরণ

এবং রান্না করার ধরণ, অতিথি অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করলে এদেরকে ইউরোপীয় অপেক্ষা এশিয়াবাসীর বেশী নিকটবর্ত্তী বলেই মনে হয়। এই অঞ্চলে আমাদের মতই মেয়েদের বড় চুল আর আজানুলম্বিত পোষাক চোখে পড়ে, আমাদের মতই এখানকার লোকে রান্নায় কিছু কিছু মসল্লাও ব্যবহার করে, যা ইউরোপের প্রধান দেশগুলির অধিবাসীরা করে না।

আমাদের দেশে হোটেলে যেমন থাকা খাওয়া দুই-ই হয়, ইউরোপের হোটেলগুলি তেমন নয়। সেখানে হোটেলগুলিতে থাকার-ই বন্দোবস্ত আছে, খাওয়ার নয়। তবে অধিকাংশ হোটেলের সঙ্গে একটি ক'রে রেস্তরাঁও যুক্ত থাকে। ঐ রেস্তরাঁয় খাওয়া মোটেই বাধ্যতামূলক নয়।

হোটেলটিতে স্নানাহার এবং বিশ্রাম করে অপরাহ্নের দিকে গেলাম আন্তর্জ্জাতিক প্রদর্শনী দেখতে। ইউরোপের ছোট বড় গোটা বারো দেশ এই প্রদর্শনীতে যোগ দিয়েছিল। বলা বাহুল্য বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি কোন সময়েই যেমন রাজনৈতিক প্রচারের কোন সুযোগ ছাড়ে না, তেমন এখানকার এই সুযোগও কেহ ছাড়ে নাই, না ছেড়েছে রাশিয়া, না ছেড়েছে জার্ম্মানী, ফ্রান্স বা ব্রিটেন। প্রদর্শনীতে যোগদানকারী প্রত্যেকটি দেশেরই একটি করে নিজস্ব বাড়ী ছিল, যাতে দর্শনীয় বা প্রচারযোগ্য সকল বিষয়বস্তুই স্থান পেয়েছিল।

এই মেলায় যাতায়াতে সুবিধার জন্য হাঙ্গেরী এবং ইতালী থেকে একটি করে বিশেষ মোটর-ট্রেণ যাতায়াত করত। ফলে বহু বিদেশী দর্শকেরও প্রতিদিন এখানে আগমন হত। অনেকের নিকট ইহা বিশেষ আকর্ষণীয় মনে হলেও আমার নিকট কিন্তু তেমন মনে হ'ল না। কারণ ইহাপেক্ষাও অনেক বড়, সুন্দর এবং দর্শনীয়, পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ১৯৩৭ সনের প্যারী প্রদর্শনী আমি দেখে এসেছি।

বেলগ্রেডের এই প্রদর্শনীটি হয়েছিল নদীর অপর পারে একটি বিস্তীর্ণ প্রান্তরে। সহরের সঙ্গে ওপারের সংযোগ সাধন করেছে একটি সুন্দর পোল। নানা দেশের নানা রংএর অসংখ্য পতাকায় শোভিত ঐ প্রদর্শনী দিনের আলোয় এক অপরূপ শোভা ধারণ করত। রং বেরং-এর আলোয় গাঢ় অন্ধকার রাত্রে ইহাকে কিন্তু আরও বেশী সুন্দর দেখাত। আর সেই সৌন্দর্য্য উপভোগের জন্য দিন অপেক্ষা রাত্রিতেই এখানে অধিক দর্শকের সমাগমও হত।

সন্ধ্যার দিকে বেড়াতে গেলাম সহরের শ্রেষ্ঠ পার্কটিতে। পার্কটির নাম 'কালেমেগদান পার্ক'। সাভা এবং দুনাভ নদী দুইটির সঙ্গমস্থানে একটি ছোট পাহাড়ে ঐ পার্কটি অবস্থিত। ইহার মধ্যে একটি চিড়িয়াখানা আছে। দেশের ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ হলেও আমি কিন্তু মোটেই আকৃষ্ট হলাম না। কারণ চিড়িয়াখানাটি ছোট, জীবজন্তুর সংখ্যা নগণ্য। তবে হাঁ,' পার্কটির

প্রাকৃতিক শোভা সত্যই সুন্দর। বৃক্ষে শোভিত পাহাড়, আর নদী দুইটি ইহার সৌন্দর্য্য শতগুণ বৃদ্ধি করেছে। ইউরোপের যে বিখ্যাত নদীটি 'ডেনিউভ' নামে আমাদের নিকট পরিচিত, তাহাই এখানে দুনাভ নাম গ্রহণ করেছে। নদীটির পরিসর কিন্তু বেশী নয়, আমাদের কলকাতার গঙ্গা অপেক্ষা অনেক ছোট। তা'ছাড়া, নদীতে না দেখলাম তেমন ঢেউ, না দেখলাম তেমন কোন স্রোত। অথচ ইউরোপের ইহা একটি প্রধান নদী। কত শত সাধারণ বিষয়ও ইহাকে কেন্দ্র ক'রে আন্তর্জ্জাতিক গুরুত্ব লাভ করে, সহজ সমস্যাও জটিল হয়ে ওঠে।

বেলগ্রেড সহরটি বেশ বড়, লোকসংখ্যা তিন লক্ষের মত। বাড়ীঘরও বড় বড় রয়েছে, দোকানপাট, হোটেল রেস্তোরাঁ, কাফে বার সকলই আছে, সিনেমারও অভাব নেই, কেবল অভাব বোধ হল একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার।

দেশের রাজধানী হওয়ায় স্বভাবতঃই কাজে অকাজে দূরে অদূরের অসংখ্য নারী পুরুষের এখানে প্রতিদিন আগমন হয়। বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন ধর্ম্মের এই সকল লোকজন যে নিজ নিজ আঞ্চলিক বা ধর্ম্মীয় প্রভাব মুক্ত নয়, তা' এদের দিকে একবার ভালভাবে তাকালেই বুঝা যায়, অর্থাৎ সারা দেশের বিভিন্ন জীবন ধারা যেন এই একটি কেন্দ্রে এসে মিলিত হয়েছে। সমগ্র ইউরোপের জীবনধারা একই খাতে প্রবাহিত হয়, প্রায় একই তাদের সকলের জীবনাদর্শ—এইরূপ যাঁরা জানেন বা

এইরূপই যাঁদের কাম্য, তাঁরা এখানে এসে ঐরূপ বিভিন্নতা লক্ষ্য ক'রে হন বিস্মিত, বিক্ষুব্ধও হন কিনা, জানি না। আর যাঁরা পশ্চিম ইউরোপের ঐ 'একঘেয়েমি'তে হন ক্লান্ত, তাঁরা এখানে এসে পান শান্তি।

পরদিন সন্ধ্যার দিকে আবার একবার প্রদর্শনী আর সহর প্রদক্ষিণে বেরুলাম। হোটেলটির সিঁড়ি বেয়ে নামছি, এমন সময়ে সিঁড়ির সংলগ্ন দ্বিতলে অবস্থিত একটি বারের (Bar) দরজায় দাঁড়ানো পরিপাটি পোষাকে দুটি সুন্দরী যুবতী আমাকে বারে প্রবেশে অভ্যর্থনা করল। চা পানের ইচ্ছা থাকলেও ঐখানে আর ঐ মুহূর্ত্তেই যে চা পান করব—এমন ইচ্ছা আমার ছিল না। তবুও অস্বাভাবিক ঐরূপ অভ্যর্থনা দেখে আমার মনে খানিকটা কৌতুহল সৃষ্টি হল। আর সেই কৌতুহলের বশেই আমিও বারে প্রবেশ করে চা'য়ের অর্ডার দিলাম। ঘরের চারদিকে একবার তাকালাম, দেখলাম—সম্মুখের ঐ উঁচু বেদীতে একদল সুন্দরীর নৃত্যগীত এবং বাজনার ব্যবস্থা রয়েছে। নৃত্যগীতের সাজ সরঞ্জাম যাহাই থাকুক, নৃত্যগীত অপেক্ষা অতিথিবর্গের সঙ্গে হৃদ্যতা সৃষ্টির ঔৎসুক্যই যেন সুন্দরীদের আচরণে বেশী প্রকাশ পেল। ইহা লক্ষ্য করে মনে মনে অনেক কিছুই আমার সন্দেহ হল।

চা' এল, সঙ্গে সঙ্গে দুটি সুন্দরীও এল। এসেই আমার দু'পাশে দুজন বসল। বসেই আমার সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিল,

কিন্তু ভাষা সমস্যায় বিব্রত হয়ে দুজনের একজন গেল চলে অন্য কাজের অজুহাতে, কিন্তু গিয়ে সে বসল আর একজনের পাশে। যেটি আমার পাশে রইল, সে দু'চারটি ইংরাজী কথা বলতে পারত। ভদ্রতার নিয়মে কেউ এসে এইভাবে আলাপ আরম্ভ করলে পানীয় দ্বারাও কিছু সাধারণ ভদ্রতা করতে হয়। কিন্তু মনে মনে ভাবলাম—'কুকুরকে লাই দিলে সে ত আরও আস্কাড়া পায়!' পরক্ষণেই মনে হল—এদের সঙ্গে সঙ্গে কুকুরের কথা মনে হওয়াটা নিশ্চয়ই শোভন হল না। আমি লজ্জিত হলাম। অবশ্য আমার এইরূপ মানসিক অবস্থার বহিপ্রর্কাশ হল কিনা বলা কঠিন, তবে আমার আচরণে যে তা' প্রকাশ পেল না, সে-বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

সঙ্গিনীটির সঙ্গে কেবল কথাবার্ত্তাই বলছি, কোন পানীয়ের অর্ডার দিলাম না দেখে শেষ পর্য্যন্ত সে-ই বিয়ারের অর্ডার দিতে গিয়ে আমার দিকে একবার সহাস্য বদনে চাইল। সেই সহাস্য বদন আর সুন্দর চাহনি দেখলে সত্যই মুগ্ধ হতে হয়। আমিও মনে মনে ভাবলাম— "সত্যই ত, আমি এত অভদ্র কেন?" পরক্ষণেই আমার মনে হল—'কি নির্লজ্জ!' আমার মন এখন দৃঢ় হল, ভাবলাম—"কোনওরূপ দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় দিলে কুফল ছাড়া সুফলের কোনও আশা নেই।" আমি এখন এক গাল হাসি হেসে আমার পকেট দেখিয়ে ইসারায় জানালাম যে আমার পকেট এখন একটি 'গড়ের মাঠ'। আমার পকেট শূন্য—ইহা যেন সে ভাবতেই পারল না। হয়ত তার তখন

ভারতের ঐ নন্দ দুলাল রাজা মহারাজাদের কথা মনে হয়ে থাকবে। অথবা ইহাও তার মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে —পয়সা না থাকলে কি আর এত দূর দেশে কেউ বেড়াতে আসে? নচেৎ আমার পকেট শূন্য দেখে প্রথমে বিস্মিত, পরক্ষণেই নূতন হাসিতে, অপরূপ ভঙ্গীতে আমার মন মাতাতে সে যেন তার সকল ক্ষমতা, সকল দক্ষতা নিয়োজিত করল। তাঁর উছলে-পড়া যৌবনের সুন্দর প্রকাশ হতে লাগল। সন্ধ্যাকালীন রঙ্গীন আলোয় আলোকিত ঐ মঞ্চোপরি বাজনার সুমধুর তালে তালে, গায়িকার সুরে সুরে, নর্ত্তকীর সৌষ্ঠব দেহের ভঙ্গীমায় একটি আবেগময় দৃশ্যের সৃষ্টি হল।

চা পান শেষ ক'রে বিশেষ কাজের অজুহাত দিয়ে ভদ্রতাসূচক মাপ চেয়ে আমি বাইরে চলে এলাম। মালিক অবশ্য আবার যেতে অনুরোধ জানালেন। ভদ্রতার খাতিরে আমিও মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম। ঐ আবেশ ছেড়ে এসে আমি যেন এখন মুক্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

পরদিন সকাল হতে না হতেই স্টেশনে এসে হাজির হলাম, যাব বুলগেরিয়া। কিন্তু স্টেশনে এসে জানলাম যে ট্রেণের বাকী আরও তিন ঘণ্টা। অর্থাৎ তিন ঘণ্টা পূর্ব্বেই এসে আমি হাজির হয়েছি। সুতরাং আমার এই দুর্ভোগের জন্য কা'কে দোষ দেব, বুঝলাম না। কারণ আমাকে যে ভুল সময় জানানো হয়েছিল। এখানেও আমাদের দেশের মত এমন বহু লোক

আছে, যারা না জেনেও একটা উত্তর দিয়ে দেয়। বেসময় আর বিপথ বলে দিতে কিছুমাত্র তারা সঙ্কোচ বোধ করে না।

স্টেশনে ডাঃ যোশেফ স্টোলফা নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার আলাপ হল। তিনি ছিলেন সরকার পরিচালিত 'পুটনিক সোসাইটির' সম্পাদক। এই সোসাইটি বিদেশী পর্য্যটকগণের ভ্রমণ এবং বাসস্থানের বন্দোবস্ত ক'রে সাহায্য করত, যেন বিদেশী পর্য্যটকরা দেশ এবং দেশবাসী সম্বন্ধে বেশ ভাল ধারণা নিয়ে যান। ফলে বিদেশে দেশের সুনাম বৃদ্ধি হবে। সুতরাং বিলম্ব হলেও এই প্রতিষ্ঠানের সংস্পর্শে আসার সুযোগ ঘটায় আনন্দিতই হলাম। আর সময় মত এদের সাহায্য পেলে যে আমি বহু অসুবিধা থেকে রেহাই পেতাম, সেবিষয়েও কোন সন্দেহ ছিল না। তবে অন্য দিক থেকে দেখতে গেলে, এদের সঙ্গে পূর্ব্বে কোন সংযোগ সাধিত না হওয়ায় আমার পক্ষে 'শাপে বর'-এর মতই হয়েছিল। কারণ স্বাধীনভাবে ঘুরতে গিয়ে নানা তিক্ত অভিজ্ঞতার দ্বারা যেরূপ লোক চরিত্র বুঝতে বা জানতে পেরেছিলাম, নচেৎ তা' থেকে আমি হতাম বঞ্চিত।

ডাঃ স্টোলফা আমার অবস্থান বিভ্রাটের কথা শুনে দুঃখ প্রকাশ করলেন, বললেন—"সুযোগ পেয়ে হোটেলওয়ালারা আপনাকে ঠকিয়েছে।" আমি জিজ্ঞেস করলাম—"কিরূপ?" তিনি উত্তর করলেন—"দেখুন, আপনি যে হোটেলটিতে ছিলেন

ঐ হোটেলটিতে আমাদের মারফৎ গেলে ত্রিশ দিনার দিতে হত, কিন্তু আপনাকে দিতে হয়েছে পঞ্চাশ দিনার।” তিনি আরও বললেন—“আমাদের অধীনে প্রায় দু হাজার হোটেল এবং পরিবার আছে। এই সকল পরিবারে ও হোটেলে ঘরভাড়া দশ দিনার থেকে একশ' দিনার পর্য্যন্ত। সুতরাং আমাদের মারফৎ গেলে কাহারোই বেশী দিতে হয় না।”

এরপর অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করলাম এবং বিভিন্ন বিষয়ে অনেক কথাই হল। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমাদের সাধারণ পরিচয় সুমধুর বন্ধুত্বে পরিণত হল।

ট্রেণের অল্প কিছুক্ষণ পূর্ব্বে বিশ্রাম-ঘরে আমার প্রবেশ মাত্র অপেক্ষমান যাত্রীদের মধ্যে বিরাট একটা আলোড়ন লক্ষ্য করলাম। বলাবাহুল্য, এই আলোড়ন ঔৎসুক্য জনিত। আমি কে বা কোন দেশের লোক, তা' জানতে যেন অনেকেই ছিল উদগ্রীব। আমার সম্মুখে ছিল দুটি মেয়ে বসে। দুটিই অল্প বয়স্কা, তাদের সহোদরা বলেই আমার মনে হল। এদের দিকে আমার দৃষ্টি পড়তেই মধুর হাসিতে বড় মেয়েটির মুখ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। পরক্ষণেই আমাদের পরিচয় আরম্ভ হল। আরও লোক এসে গভীর ঔৎসুক্য নিয়ে আমাদের চার পাশে বসল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে সে ঐ দেশেরই একজন অধিবাসী কিনা। মাথা নেড়ে সে জানাল যে ঐ দেশেরই সে মেয়ে, সঙ্গের ছোট মেয়েটি তার বোন। আমাকে এখন

সে তাদের ভাষায় কি জিজ্ঞেস করল। কিন্তু তার কথার বিন্দুবিসর্গও বুঝলাম না। কোন উপায় না দেখে সে এখন দেয়ালে টানানো একটি পৃথিবীর মানচিত্রের নিকটে গেল। গিয়ে সে ভারতের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। এইভাবে ইসারায় ইঙ্গিতে সে জানাল যে একই ট্রেণে তারাও যাবে।

এমন সময়ে ট্রেণ এসে বেলগ্রেডের প্ল্যাটফর্মে থামল। যাত্রীরা সব যার যার মালপত্র নিয়ে উঠে পছন্দমত যায়গায় বসল। আমিও একটি তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে উঠলাম, আর মেয়েটি গেল প্রথম শ্রেণীতে।

ট্রেণ ছাড়ল। পুটনিক সোসাইটির সেক্রেটারী এসে আমাকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে প্ল্যাটফর্মেই দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর ট্রেণ অদৃশ্য না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি ঐভাবেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রুমাল উড়িয়ে আমাকে তাঁর শুভেচ্ছা এবং প্রীতি জানালেন।

ধীরে ধীরে ডাঃ স্টোলফা অদৃশ্য হয়ে গেলেন। মনটা যেন আমার ক্ষণেকের জন্য কেমন হয়ে উঠল। এমন সময়ে সম্মুখ-পানে চাইতেই দেখলাম প্রথম শ্রেণীর কামড়া থেকে সেই মেয়েটি আমার কামড়ার দিকে তাকিয়ে আছে। দৃষ্টি বিনিময় হতেই হাসিতে তার মুখ ভরে গেল। তারপর রুমাল উড়িয়ে সেও প্রীতি সম্ভাষণ আমায় জানাতে লাগল। এইরূপ প্রায় প্রতি স্টেশনেই হল।

আমার কামড়ায়ও সহযাত্রীদের সঙ্গে ধীরে ধীরে এক প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠল। সকলের এইরূপ প্রীতি এবং শুভেচ্ছার মধ্যে আমাদের সকল ব্যবধান, সকল পার্থক্য যেন লুপ্ত হয়ে গেল।

ইউরোপের ট্রেণগুলিতে প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত যাতায়াতের জন্য একটি পথ থাকে। সুতরাং ট্রেণ চলবার কালেও যাত্রীরা এক কামড়া থেকে অন্য কামড়ায় যেতে পারে।

একজন সহযাত্রীর সঙ্গে আলাপে আমি যখন ব্যস্ত, তখন ঐ মেয়েটি এসে এক কোণে হাসিভরা মুখ নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হতেই আমি আমার শুভেচ্ছা জানিয়ে তাকে বিদায় সম্ভাষণ জ্ঞাপন করলাম। ইতিমধ্যে ট্রেণটি এসে নিস পৌঁছল। নিস একটি বড় রেল জংসন। এই নিসই মেয়েটির গন্তব্যস্থল।

এখানে নেমে মেয়েটি তাড়াতাড়ি এক তাড়া ফুল এনে আমাকে উপহার দিয়ে মন্তব্য করল—"আপনাকে এবং আপনার মারফৎ আপনার দেশকে আমার এই প্রীতি উপহার দিলাম।"

ট্রেণ ছাড়ল, প্রথম ধীরে। ট্রেণের গতির সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটিও সম্মুখ দিকে এগিয়ে প্ল্যাটফর্মের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চোখে মুখে হাসি নিয়ে অপলক দৃষ্টিতে

ট্রেণটির দিকে তাকিয়ে রইল, আর রুমাল উড়িয়ে শুভেচ্ছা প্রকাশ করতে লাগল।

এক্সপ্রেস ট্রেণ; সুতরাং সকল স্টেশনে থামল না। ট্রেণ চলেছে দ্রুত গতিতে। ডোবা নালা, বন উপবন, পাহাড় পর্ব্বত, দূরবিসারী প্রান্তর পার হয়ে ট্রেণ চলল, নগর পল্লী—কোথাও আর থামে না। মাঝে মাঝে পথে পথে কত শত ছেলে ছোকরা এসে ভীড় ক'রে দাঁড়াল, রুমাল উড়িয়ে তাদের হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ের শুভেচ্ছা আমাদের জানাল, কিন্তু তবুও ট্রেণের গতিবেগে বিন্দুমাত্র তারতম্য ঘটল না, একরোখা জীবজন্তুর মত ভ্রূক্ষেপহীন হয়ে দ্রুত গন্তব্যস্থান অভিমুখে চলেছে। মনে হল—কৃপা করে যেন যাত্রীদের বক্ষে ধারণ করে সে চলেছে, মাঝে মাঝে নৃত্যভঙ্গীমায় হেলে দুলে এঁকে বেঁকে চলেছে।

একে একে আমার পরিচিত যাত্রীগণ সকলেই নেমে গেলেন। সুতরাং আমি সত্যই একাকী, সত্যই নিঃসঙ্গ। নিঃসঙ্গীর মতই আমি এখন ট্রেণের পথ-পার্শ্বে দাঁড়িয়ে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি কিন্তু জানালা দিয়ে প্রকৃতি রাণীর সৌন্দর্য্য উপভোগে বিভোর হয়ে আছি। বেশীক্ষণ বোধহয় এমনভাবে আমি ছিলাম না। পাশেই খস্ খস্ আর ফিশ্ ফিশ্ শব্দে আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হল। আড় চোখে তাকিয়ে দেখি জন তিনেক মহিলা। মহিলাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধা, একজন মধ্যবয়স্কা, আর তৃতীয়াটি অল্প বয়স্কা। বয়সের দিক থেকে অনুমান করলে প্রথমাকে ষাটের কোঠায়, দ্বিতীয়াকে ত্রিশের

কোঠায়, আর কনিষ্ঠাকে ষোল সতেরোর মত মনে হয়। একটি পরিবারের লোক বলেই তাদেরকে আমার মনে হল, মুখাবয়বে তা' সুস্পষ্ট প্রকাশ রয়েছে। এককালে বৃদ্ধা যে বেশ সুন্দরী ছিল, তা' তার চেহারায় এই শেষ বয়সেও প্রকাশ রয়েছে, আর সেই রূপ ও লাবন্যের অধিকারিণী হয়েছে এখন ঐ তন্বী কনিষ্ঠা।

আমি কে বা কোন্ দেশের লোক—তা' নিয়ে যেন তারা মহাসমস্যায় পড়েছে। কেউ বলে আবিসিনিয়া, কেউ বলে আরব, আর কেউ বলে জাপানী। কিন্তু কিছুতেই যেন তাদের সমস্যার সমাধান হল না, কৌতুহলের পরিসমাপ্তি ঘটল না। তাই মধ্যবয়স্কা যে, সে কনিষ্ঠাকে ঠেলছে আর ফিস্ ফিস্ করে বলছে—জিজ্ঞেস কর্ না? আড় চোখে এসব ঠেলাঠেলি দেখে আমার বিপুল হাসি পেল, কিন্তু অতি কষ্টে তা' চেপে রেখে যথা পূর্ব্বং এক মনে আর সেই পলকহীন দৃষ্টি নিয়ে বাইরের দৃশ্যাবলীর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

কিছুক্ষণ পরে কনিষ্ঠা মেয়েটি আমাকে এসে জিজ্ঞেস করল —"মাপ করুন, আপনি কোন দেশের লোক, জানতে পারি কি?" আমার উত্তর শুনে সে তা' অন্যান্যদের বুঝিয়ে দিল। পরক্ষণেই আবার আমাকে সে প্রশ্ন করল—"কোত্থেকে আপনি এসেছেন, আর কোথায় আপনি এখন চলেছেন?" এর উত্তরও সে আবার তাদের বুঝিয়ে দিল। এইভাবে প্রশ্নের পর প্রশ্ন সে আমাকে ক'রে চলল। ক্রমেই প্রশ্ন ও উত্তরের মধ্যে সময়ের ব্যবধান ঘুচে গিয়ে শেষ পর্য্যন্ত তা এক টানা আলাপ

আলোচনায় পর্য্যবসিত হল। কথায় কথায় সে জানাল যে তার নাম মিস্ পেপা ডঃ উজুনভা (বুলগেরিয়ায় নামের সঙ্গে পিতার নামও যুক্ত থাকে, যেমন আমাদের দেশের অবাঙ্গালী অনেকের মধ্যে রয়েছে), সোফিয়ায় আমেরিকান কলেজের ছাত্রী সে, বাড়ী তার বুলগেরিয়ার অন্তর্গত একটি ছোট্ট সহর স্তারা যাগোরায়, পিতা তার একজন বড় ডাক্তার। আরও প্রশ্নের উত্তরে সে জানাল যে মা ও ঠাকুমাকে সঙ্গে ক'রে সে গিয়েছিল প্যারীতে প্রদর্শনী দেখতে, এখন দেশে ফিরছে। তারপর কথাপ্রসঙ্গে সে বলল —"মা আমায় বললেন যে ভদ্রলোক বিদেশী। এই দূর বিদেশে কেমন নিঃসঙ্গ হয়ে চলেছেন, কত কষ্টই না হচ্ছে! যাও, তার সঙ্গে আলাপ পরিচয় কর। আমাদের দেশ সম্বন্ধে জানতে তাকে সাহায্য কর।" শুনে সত্যই আমার আনন্দ হল, মনে মনে ভাবলাম—"জ্ঞাতি নন, স্বদেশী নন, কোন্ দূর বিদেশের একজন মহিলা। তিনিও এইরূপভাবে একজনের জন্য দরদ দিয়ে ভাবেন, কিসে তার কষ্টের লাঘব হবে, সেজন্যও তার এইরূপ আন্তরিক চেষ্টা!" মহিলার প্রতি শ্রদ্ধা আমার বেড়ে গেল। বলা বাহুল্য, তাঁদের সহরে, তাঁদের বাড়ীতে আমার আমন্ত্রণ হল। আর সেই আমন্ত্রণ বাধ্য হয়েই আমাকে গ্রহণও করতে হল, যদিও তাঁদের বাড়ী ছিল আমার গন্তব্য পথের বাইরে অনেক দূরে।

ঐ ট্রেণে বুলগেরিয়ার আর একটি মেয়ের সঙ্গেও আমার আলাপ পরিচয় হয়েছিল। সেও ছিল সোফিয়ার আমেরিকান

কলেজের একজন ছাত্রী। ইংরাজী জানা একজনের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ে কিছুটা সময় কাটানোর সুযোগ ঘটায় স্বভাবতঃই আমি খুসী হয়েছিলাম। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই তার মা এসে তাকে ডেকে নিয়ে গেল। শুধু তাই নয়, আমার লেখা যে ইংরাজী বইখানা সে পড়তে নিয়েছিল, তা'ও ফেরৎ দেওয়া হল। মেয়েটির মা যে বেশ একজন সংরক্ষণশীলা মহিলা, তা'তে কোন সন্দেহ নেই।

যুগোশ্লাভিয়ার শ্লোভেনিয়া ও ক্রোশিয়ায় যেরূপ সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য চোখে পড়েছিল এবং উপকূলভাগেও যেরূপ মুগ্ধকর দৃশ্য উপভোগ করেছি, সেরূপ দৃশ্য কিন্তু এই অঞ্চলে আর চোখে পড়ল না। ট্রেণ ক্রমেই সীমান্তের দিকে এগিয়ে চলেছে।

পথিমধ্যে যে সকল বড় বড় স্টেশনে ট্রেণ থামল, সেখানেও কিন্তু তেমন কিছু খাবার পেলাম না। খাবার মধ্যে পেলাম স্যাণ্ডউইচ্ (পাতলা এক টুকরো লবনাক্ত শূকরের মাংস-যুক্ত রুটি)। ইহাতেই আমার প্রজ্জ্বলিত ক্ষুধানল শান্ত করতে হল।

সারাদিন চ'লে ওরিয়েণ্ট এক্সপ্রেস ট্রেণটি সন্ধ্যা রাত্রিতে এসে সীমান্তবর্ত্তী স্টেশনে পৌছল। জায়গাটির নাম চারিব্রড্ (Tsaribroad)। এখানে এসে ট্রেণ কর্ম্মচারীর পরিবর্ত্তন হল, যাত্রীদের পাশপোর্ট পরীক্ষা হল, মালপত্রও সাধারণভাবে

তল্লাসি করা হল। ইউরোপের দেশে দেশে তামাকের উপরেই যেন শুল্ক কর্ম্মচারীদের নজর বেশী!

এক দেশ থেকে আর এক দেশে যেতে যাত্রীদের ট্রেণ বদল করতে হয় না। শুধু ইঞ্জিনটির পরিবর্ত্তন হয়, আর পরিবর্ত্তন হয় কর্ম্মচারীদের।

চারিব্রডে ট্রেণ পৌঁছলে একজন আমেরিকান যাত্রী উঠলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হল। পরিচয়ে জানলাম যে তিনি একজন আমেরিকান, কিন্তু বুলগেরিয়ার নাগরিক। বুলগেরিয়ার পাশপোর্ট তাঁর সঙ্গে ছিল। সীমান্তে তিনি যে দুর্ভোগ ভুগেছেন, তা' তিনি আমাকে বললেন, বললেন, "সোফিয়ায় অবস্থিত যুগোশ্লাভিয়ার কন্সাল আমাকে জানালেন যে তাদের দেশে যেতে বুলগেরিয়ার নাগরিকের কোন ভিসা (visa) প্রয়োজন হয় না। কিন্তু তাঁর কথা শুনে ভিসা না নিয়ে এসে এখন আর সীমান্ত পার হতে পারলাম না। অর্থাৎ কন্সালের ভুল বা অজ্ঞতার জন্য আমাকে শুধু দুর্ভোগই ভুগতে হল না, বেশ কিছু অর্থদণ্ডও দিতে হল।" শুনে আমি দুঃখিত হলাম। দেশের এই সকল সরকারী প্রতিনিধি কন্সালদের অজ্ঞতার ফলে যে বহু লোকের বহু হয়রানি হয়, অনর্থক অর্থদণ্ডও দিতে হয়, আর আমিও যে তাদের একজন ভুক্তভোগী, তা' তাঁকে আমি বললাম। সমদুঃখে দুঃখী জেনে এখন যেন তাঁর দুঃখের অনেকটা লাঘব হল।

স্বভাবতঃই তিনি জানতে উদগ্রীব হলেন—কোথায় আর কিভাবে আমার হয়রানি হল। আমি বললাম—"পূর্ব্ব এশিয়া ভ্রমণকালে ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলায় ডাচ কন্সাল আমাকে বলেছিলেন যে তাঁদের শাসনাধীন অঞ্চলে অর্থাৎ যাভা, সুমাত্রা ভ্রমণে ব্রিটিশ প্রজার কোন ভিসা প্রয়োজন হয় না, কিন্তু সত্যই যখন বিনা ভিসায় যবদ্বীপে গেলাম, তখন আর জাহাজ থেকে অবতরণের অনুমতি পেলাম না। তারপর সেখানকার অধিবাসী একজন ভারতীয় জামিন দাঁড়ালে আমি অবতরণের অনুমতি পাই। কিন্তু সুমাত্রা ভ্রমণে আবার সেই বিপদে পড়লাম। অর্থাৎ ভিসা নেই—এই অজুহাতে আমাকে পুলিশ হাজতেই যেতে হল এবং শেষ পর্য্যন্ত জাহাজে ক'রে পুলিশ পাহাড়ায় সিঙ্গাপুরে যেতে বাধ্য হই।" তারপর আরও যে সকল দুর্ভোগ আমাকে ভুগতে হয়েছিল, তার বিবরণও যখন দিতে লাগলাম, তখন তাঁর বিমর্ষ মুখমণ্ডলেও হাসি ফুটে উঠল, হয়ত এই ভেবে যে তাঁর ঐ সামান্য দুর্ভোগ আমার তুলনায় কিছুই নয়।

ট্রেণের যাত্রা কিছুক্ষণ পর আবার শুরু হল, দ্রুতগতিতে নয়, ধীরে ধীরে। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা সীমান্ত পার হয়ে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে যুগোশ্লাভিয়ায় আমার ভ্রমণ বিগত স্মৃতি কথায় পরিণত হল। কত শত সুখস্মৃতি বিজড়িত যুগোশ্লাভিয়ায় আমার ভ্রমণের দিনগুলি একে একে এখন আমার চোখের সামনে উপস্থিত হলে হর্ষে ও বিষাদে আমি অভিভূত হলাম।

বুলগেরিয়া

বুলগেরিয়া

"যাহা কিছু হেরি চোখে কিছু তুচ্ছ নয়,
সকলি দুর্লভ ব'লে আজি মনে হয়।
দুর্লভ এ ধরণীর লেশতম স্থান,
দুর্লভ এ জগতের ব্যর্থতম প্রাণ।"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দেশের পর দেশ ভ্রমণ করেও নূতন দেশের আকর্ষণ আমার উপরে একই রকম রইল। সীমান্ত পার হতেই যুগোশ্লাভিয়া আমার মন থেকে সরে গেল। এখন নূতন দেশকে নূতন কল্পনায়, নূতন রং-এ আমার মন রাঙিয়ে তুলল। বুলগেরিয়ার প্রচার পুস্তিকাগুলি আমার চোখের সামনে এখন ভেসে উঠল, ভেসে উঠল লোভনীয় প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি, সমুদ্র সৈকতের মন ভোলানো ছবি, আর ঘাটে মাঠে ঐ বিচিত্র পোষাক পরিহিতা কাস্তে হাতে কৃষক রমণীদের ছবি।

ট্রেণ এসে ড্রাগোমান স্টেশনে থামল। আবার সেই শুল্ক কর্ম্মচারীর দল, পাশপোর্ট পরীক্ষক, টিকিট পরীক্ষক এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষক—এক কথায় সকল পরীক্ষকের ট্রেণটিতে আগমন হল। তারা অবশ্য নূতন দেশের নূতন দল। যথা কর্ত্তব্য ক'রে

অর্থাৎ সকল কিছুর ওলট পালট ক'রে তারা সকলে বিদায় নিল। বিদায় নিতেই ট্রেণটি দ্রুতগতিতে রওনা হল।

সীমান্তের সংলগ্ন ড্রাগোমান স্টেশনটি ছোট্ট, অবশ্য সহরটিও ছোট। ইহার অদূরেই ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে সার্ব্বীয় সৈন্যদের সঙ্গে বুলগেরিয়ার যুদ্ধ হয়েছিল। পুরানো হলেও সেই স্মৃতিকথা এখানে এলে মনে হয়।

ট্রেণ চলেছে, রাত্রিও বাড়ছে। রাত্রির অন্ধকার চারিদিকে পরিব্যপ্ত হয়ে রয়েছে। সূচিভেদ্য অন্ধকার। বাইরে তাকিয়ে জমাট অন্ধকার ভেদ করে দৃষ্টি প্রসারিত হয় না। এক জায়গায় বসেও যে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে পরিতৃপ্ত হব, সে উপায় নেই। দূরে দূরে মাঝে মাঝে আলোগুলি লোকালয়ের অস্তিত্ব ঘোষণা করছে। ক্রমে এই আলোও বিরল হয়ে উঠল।

রাত্রি বৃদ্ধি হয়, আর আমার দুশ্চিন্তা বাড়ে। মধ্যরাত্রির নিস্তব্ধতায় বিদেশ বিভূঁয়ে এক অপরিচিত সহরে কোথায় আমার আশ্রয় জুটবে, কিভাবে আমার জঠরানল নিবৃত্ত করব—সেই চিন্তায় আমি বিব্রত হলাম। পাশের ঐ আমেরিকান বন্ধুটি আমার অসুবিধা বুঝতে পেরে নিজেই বললেন—"সোফিয়াতে আমি থাকি। ওখানকার সবই আমি চিনি। আমি আপনাকে সাহায্য করব। আপনার কোন অসুবিধা হবে না।" বলা বাহুল্য অপরিচিত বন্ধুর এইরূপ সাহায্যের প্রস্তাবে আমি একটি দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হলাম।

যুগোশ্লাভিয়ার সীমান্ত থেকে সোফিয়া খুব বেশী দূরে নয়। মধ্যরাত্রিতে এসে এখানে ট্রেণটি পৌছল।

সোফিয়ার স্টেশনে নামলাম, আমেরিকান বন্ধুটিও নামলেন। নেমে স্টেশনের বাইরে এসে গাড়ীর খোঁজ করলাম, কিন্তু কোন গাড়ীই কোনদিকে চোখে পড়ল না, ঘোড়ার গাড়ী বা ট্যাক্সি, কোনটাই নয়। গাড়ীর অপেক্ষায় না থেকে দুজনেই চলতে আরম্ভ করলাম, তবে প্রথমে ধীরে ধীরে। চলতে চলতে এসে ট্রাম লাইনে পড়লাম, কিন্তু ট্রাম চলাচলও তখন বন্ধ হয়েছে। সুতরাং গাড়ীর আশা ছেড়ে দিতে হল। এখন ক্ষুধা নিবৃত্তির চেষ্টায় সম্মুখের রেস্তরাঁগুলির দিকে তাকালাম, কিন্তু কোথাও কোন জীবনের স্পন্দন অনুভূত হল না। তাই সহরের দিকে চলা ভিন্ন গত্যন্তর নেই।

সহর স্টেশন থেকে প্রায় এক মাইল দূরে। একটি বড় রাস্তায় হেঁটে হেঁটে সহরে চলেছি। রাস্তাটি বড় হলেও পিচের নয়। খোয়াগুলি ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত রয়েছে। রাস্তায় আলোও পর্য্যাপ্ত নয়। চলতে গিয়ে রাস্তায় বার কয়েক হোঁচট খেলাম। হোঁচট খাই আর সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করি—"সহরে যাবার আর কোন ভাল রাস্তা নেই?" আমার প্রশ্নে সঙ্গী যেন অপ্রতিভ হলেন, তারপর বললেন, "সারাদিন না খেয়ে পরিশ্রান্ত দেহ নিয়ে অনভ্যস্ত পথে চলতে গিয়ে খানিকটা ত অসুবিধা হবেই।" আমি তাঁকে উত্তর করলাম—"পরিশ্রান্ত দেহ নিয়ে চলা অচলার

অসুবিধার কথা বলছি না। আপনাকে জিজ্ঞেস করলাম যে সহরে যাবার আর কোন ভাল রাস্তা আছে কিনা।” তিনি বললেন—“এটাই ত বড় রাস্তা।” আমি বললাম—“রাস্তাটা ত বড়ই, তবে ইহার অবস্থা ত শোচনীয়। চলতে গিয়ে গণ্ডায় গণ্ডায় হোঁচট খেতে হয়।” তিনি বললেন—“তবে ত আপনি শুনে আশ্চর্য্য হবেন যে ইহাই সহরের সর্ব্বপ্রধান রাজপথ। ইহারই নাম মারিয়া লুইসা এ্যাভেনিউ।” আমি উত্তর করলাম—“সত্যই আশ্চর্য্য হলাম। রাস্তাটির নাম ত বেশ শ্রদ্ধেয়। নামটির সম্মান কিন্তু রাস্তাটি রক্ষা করছে না।”

চলতে চলতে সহরের অভ্যন্তরে এসে পৌঁছলাম। রাস্তার পাশে যে রেস্তরাঁটি খোলা ছিল, তা’ও বন্ধ হয়ে যায় দেখে আমরা দু’জন এসে সেখানে প্রবেশ করলাম। আবার জানালা কপাট খুলল, কাঁটা চামচের ঝনঝন শব্দ হল, কিন্তু কাটা চামচ ব্যবহার করার মত খাবার ছিল না কিছুই। থাকবার মধ্যে ছিল রুটি আর মিষ্টান্ন অর্থাৎ পায়েস। মিষ্টান্ন এদেশেও পাওয়া যায় জেনে পাঠকের মত আমিও বেশ আশ্চর্য্য হয়েছিলাম। প্রথমে একবার অবশ্য মনে হল—পায়েস-ই ত, অন্য কিছু নয় ত? কিন্তু খেতে গিয়ে দেখলাম যে উহা সত্যই মিষ্টান্ন, যেভাবে আমরা তৈয়ারী করি, সে ভাবেই তৈয়ারী। বলাবাহুল্য বহুদিন বাদে এই মিষ্টান্ন পেয়ে সত্যই আমি খুসী হয়েছিলাম।

পায়েস খেতে খেতে আমেরিকান বন্ধুটি বললেন—"এখানকার ইহা খুব প্রিয় খাদ্য, আর কোথাও ইহার স্বাদ জানে না, তৈয়ারী করতে ত নয়ই।" উত্তরে আমি জানালাম যে মিষ্টান্ন জিনিষটি আমাদের নিকট মোটেই নূতন নয়, অজ্ঞাত ত নয়ই, আর এই মিষ্টান্ন কিন্তু বুলগেরিয়ার নিজস্বও কিছু নয় ?

শত শত বৎসর ধ'রে তুরস্কের অধীনে এই দেশটি ছিল। তার ফলে এই দেশবাসীরা তুর্কীদের দ্বারা সকল বিষয়েই বিপুলভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। এই তুরস্কের মারফতই ঐ মিষ্টান্নের প্রচলন এইদেশে হয়, শুধু এইদেশেই নয়, পার্শ্ববর্ত্তী দেশগুলিতেও কিছু কিছু হয়। আর শুধু মিষ্টান্নই বা কেন, মসল্লা দিয়ে যে রান্নার পদ্ধতি, তা'ও ত এই তুরস্কের মারফৎই ইউরোপের এই অঞ্চলে প্রচলিত হয়।

মিষ্টান্ন জিনিষটি তুরস্কের নিজের উদ্ভাবিতও কিছু নয়। বস্তুতঃ ইহা ভারতীয় খাদ্য, তুরস্কের মারফৎ ইউরোপের এই দেশগুলিতে প্রচলিত হয়েছে। তেমনই মসল্লা দিয়ে রান্না করার পদ্ধতিটিও মূলতঃ ভারতীয় এবং ভারত হতেই দেশ দেশান্তরে ইহা বিস্তার লাভ করেছে। কারণ, দেখা যায় ভারতের সঙ্গে যাদের সঙ্গেই প্রাচীনকালে খুব বেশী যোগাযোগ ছিল, তারাই মসল্লা দিয়ে রান্নার পদ্ধতিটি গ্রহণ করেছিল। আর নিকট প্রাচ্যে মসল্লা উৎপন্নও হত না, এখনও

খুব বেশী হয় না। প্রাচীনকালে যে সকল জায়গায় এই মসল্লা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হত, সেগুলির অধিকাংশই ছিল বৃহত্তর ভারতের অংশ বিশেষ। এই মসল্লার জন্যই বোধ হয় ঐগুলি Spice Lands বা মসল্লার দেশ বলেও অভিহিত হত। অবশ্য বর্ত্তমানে আর কেউ Spice Lands বলে না, বিভিন্ন নামেই দেশগুলি অভিহিত হয়, যেমন যাভা, সুমাত্রা, সেলিবিস, বোর্ণিও, ইত্যাদি। কিন্তু যে সকল দেশের সঙ্গে ভারতীয়গণের নৈতিক সংযোগ দৈহিক সংযোগ অপেক্ষা বেশী ছিল, সেই সকল দেশে বর্ত্তমানেও আমাদের মত এত মসল্লা ব্যবহার করে না, যেমন চীন, জাপান।

আমার কথা শুনে আমেরিকান বন্ধুটি যেন আকাশ থেকে পড়লেন, তাঁর বুলগেরিয় নাগরিকত্বের আভিজাত্যবোধে যেন প্রচণ্ড আঘাত পড়ল। তাই ক্ষণেকের জন্য তিনি বিমূঢ় হলেন, পরক্ষণেই অবশ্য হাসিমুখে তিনি মন্তব্য করলেন—"তাই নাকি? আমি কিন্তু তা' জানতাম না।" আমি বললাম—"না জানায় আর দোষ কি? সকল কিছুই কি একজন লোক জানতে পারে? আমার নিজের কথা বললে—আমি জানি ত কত অল্প, জানি না—এমন তত্ত্ব, এমন তথ্যই ত বেশী, আর শুধু বেশীই বা বলি কেন, আমার না জানার ভাগই সব, জানার ভাগ ক্ষুদ্রতম বললেও অত্যুক্তি করা হয়।"

আমাদের এইভাবে কথাবার্ত্তা বলতে দেখে রেস্তরাঁর মালিকেরও ঔৎসুক্য সৃষ্টি হল। আমাদের মধ্যে কি কথো-

পকথন হল আমেরিকান বন্ধুটি তাকে বুঝিয়ে বলতে সেও বেশ খানিকটা আশ্চর্য্য হল, তারপর মন্তব্য করল—"হ্যাঁ, আমরাও ত তাই জানি, জানি যে তুরস্ক থেকেই এই ধরণের রান্নাবাড়ি দেশে বিদেশে প্রচারিত হয়েছে।"

রাত্রি অনেক হয়েছে, পথশ্রমে ক্লান্ত দেহে ঘুমের ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠল। কথায় যেমন কথা বাড়ে, আলোচনাও বাড়ালেই বাড়ে। সুতরাং কথা ক্রমেই সংক্ষেপ করে খাওয়া শেষ করে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম। এখনও ত হোটেল খোঁজার প্রধান কাজটিই বাকী। তবে এই দুশ্চিন্তার ভার বন্ধুটির উপরে রেখে আমি বেশ নিশ্চিন্তই ছিলাম। কারণ হোটেল না পাই ত শেষ পর্য্যন্ত তাঁর বাড়ীতেই যে ওঠা যাবে—এমন একটা বিশ্বাস আমার মনে স্থান পেয়েছিল।

হোটেল খোঁজা আরম্ভ হল। এক একটি হোটেলে যাই, অর্গল বদ্ধ দরজায় করাঘাত করি, কড়া নাড়ি। কোনটা থেকে প্রশ্ন হয়—"কি চাই, মশাই?" কোনটা থেকে উত্তর হয়—"মধ্যরাত্রি পার হয়ে গেছে, ষ্টেশনে থাকতে পারলেন না? এসেচেন বিরক্ত করতে?" কিন্তু কথায় কথা বাড়ে—মনে করে নিরুত্তর থেকে অপর যায়গায় চলি।

কিছুক্ষণ পর একটি হোটেল পাওয়া গেল। চিন্তার একটা বোঝা এতক্ষণে মাথা থেকে নেমে গেল, যেন আমার রাহুমুক্তি ঘটল।

হোটেলটির নাম 'সোফিয়া প্যালেস্'। দ্বিতলে সাজানো গোছান বেশ বড় একখানি ঘর আমি পেলাম। ঘরখানির জন্য দৈনিক ভাড়া দিতে হল মাত্র পঞ্চাশ লেভা, প্রায় এক টাকা ছয় আনা। ভাড়া বেশ কম। ইউরোপের বিবেচনায়ই কম নয়, ভারতের তুলনায়ও বেশ কম।

হোটেলটিতে আমার থাকবার বন্দোবস্ত ক'রে আমেরিকান বন্ধুটি বিদায় গ্রহণ করলেন। বলা বাহুল্য, তাঁর এইরূপ সাহায্য না পেলে আমাকে যে বেশ খানিকটা দুর্ভোগই ভুগতে হত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আর যাঁর এতটা সাহায্য আমি পেলাম, সেই বন্ধুর নাম ঠিকানা আমি জানতেই গেলাম ভুলে। এই ভুল যে আমার ইচ্ছাকৃত, তা' নয়, ভুল আমার অভ্যাস দোষে। কারণ নাম ঠিকানা আমি সাধারণতঃ কাউকে জিজ্ঞেস করি না। তা' হলেও বিদায়কালে আমি তাঁকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাতে ভুলিনি।

শ্বেতকায় জাতির যত লোকের সঙ্গেই আমি আলাপ পরিচয় করেছি, তাদের মধ্যে আমেরিকানদেরই আমার ভাল লেগেছে বেশী, ভাল লেগেছে তাদের মন খোলা আলাপ আলোচনা ব্যবহারে। ইউরোপীয়দের তুলনায় আমি এই আমেরিকানদের সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ বলেই মনে করি। এদের মত দরদী, মনখোলা মানুষ খুবই কম দেখা যায়। অবশ্য তাদের বিচার করতে হয় তাদের দেশের তাদের আবহাওয়ায় অথবা কোন স্বাধীন দেশের মুক্ত আবহাওয়ায়। এদের অধিকাংশের

মনে জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ববোধের কুসংস্কার ইউরোপের তুলনায় অনেক কম। কম না হলে কি পরাধীন ভারতের স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় ঐরূপ অভ্যর্থনা এবং সম্মান লাভ করতে পারতেন ?

পরদিন সকালে হোটেলটির রেস্তর াঁয় চা খেতে বসে একজন হাঙ্গারীয় ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার আলাপ হল। পরিচয়ে জানলাম যে তিনি হাঙ্গারীয় মন্ত্রীসভার বৈদেশীক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর প্রধান সেক্রেটারী। ইংরাজী তিনি ভালই জানতেন। সুতরাং আলাপ আলোচনায় কা'রও কোন অসুবিধা হল না। কথায় কথায় জানলাম যে স্যার জাফরুল্লা খানের সঙ্গেও তাঁর আলাপ আছে, আলাপ হয়েছিল বুদাপেস্তে।

প্রাতরাশ সেরে সহর দেখতে বেরুলাম। সহরটিকে প্রথম প্রদক্ষিণ করে নিলাম, কিন্তু দেখে সত্যই হতাশ হলাম। পথে পথে চলি আর ভাবি—"এই নাকি দেশের রাজধানী ? এই কি সেই সোফিয়া, যে সোফিয়া প্রচার পুস্তিকার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় ছবির মত বর্ণিত হয়েছে ?" ইউরোপের কোন দেশের রাজধানী যে এইরূপ থাকতে পারে, তা' না এলে, না দেখলে বিশ্বাসই হয় না। অথচ সোফিয়া সত্যই দেশের রাজধানী, রাজধানীর ঐতিহ্য সে বহন করে।

সোফিয়ার রাস্তাগুলির অধিকাংশই সোজা। কিন্তু রাস্তাগুলি পিচের ত নয়ই, খোয়াগুলিও ভালভাবে বসানো

হয়নি। সুতরাং রাস্তায় চলাফেরায় অসুবিধা যেমন, তেমন মোটর চলাকালে যে ধূলি ওঠে, তা'তে পথচারীদের অসুবিধার আর অন্ত থাকে না। বাড়ীঘরগুলিও ছোট ছোট। তা' ছাড়া, সহরের রাস্তাঘাট তেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নও রাখা হয় না।

সহরের যে বাগানটি বিশেষভাবে খ্যাত, সেই 'টাউন গার্ডেন'ও আমাদের কলকাতার সাধারণ একটি পার্কের মতই। আর যে রাজপ্রাসাদের সুখ্যাতি দেশবাসীর মুখে মুখে প্রচারিত, প্রচার পুস্তিকায় যার সৌন্দর্য্য সাড়ম্বরে হয় ঘোষিত, সেই রাজপ্রসাদও তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু ব'লে আমার মনে হল না। আমার চোখে উহাকে আমাদের দেশের একজন সাধারণ ধনীর একখানি বাড়ীর মতই মনে হল। যে কয়টি যাদুঘর এখানে আছে, সেগুলি দেশের প্রাচীন ইতিহাস জানতে সাহায্য করলেও বিদেশ সম্বন্ধে তেমন জ্ঞান বিতরণ করে না। তাদের সংগ্রহ ব্রিটেন, ইতালী, ফ্রান্স বা জার্ম্মানীর মিউজিয়ামগুলির তুলনায় কিছুই নয়। সুতরাং সহরটি দেখে দেশের অর্থনৈতিক দারিদ্র্য সম্বন্ধেও একটা ধারণা জন্মে। অন্যান্য ইউরোপীয়দের তুলনায় ইহাদের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ। খারাপের অর্থ এই নয় যে দলে দলে ভারতের মত, বিশেষতঃ আমাদের বাংলাদেশের মত ভিক্ষুক সেখানে ভিক্ষা করতে বেরোয়, বেরিয়ে ঘরে ঘরে হানা দেয়।

বুলগেরিয়ার উভয় দিকে দেশে দেশে বিরাট শিল্পবিপ্লবের মাধ্যমে জনগণের আর্থিক ক্রমোন্নতি ঘটে থাকলেও এই

দেশ শিল্পক্ষেত্রে তেমন অগ্রসর হতে পারেনি। ইহা একটি কৃষিপ্রধান দেশ অর্থাৎ কাঁচামালের দেশ।

এই দেশের রাজার উপাধিও ছিল জার, যেমন বিপ্লব পূর্ব্ব যুগে রুশিয়াতে ছিল। একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে চালচলনে ব্যবহারে কথাবার্ত্তায় খাঁটি বুলগেরিয় হলেও কিন্তু এই দেশের রাজারা রক্তমাংসে বুলগেরিয় ছিলেন না। সর্ব্বশেষ যে রাজা ১৯১৮ সনে বুলগেরিয়ার সিংহাসনে আরোহন করেন, সেই জার তৃতীয় বোরিসও কিন্তু রক্তমাংসে বুলগেরিয় নন, যদিও চালচলন কথাবার্ত্তায় তিনি অন্যান্য বুলগেরিয়দের মতই খাঁটি একজন বুলগেরিয়। তাঁর ধমনীতে জার্ম্মাণ রক্ত প্রবাহিত হয়, আর তাঁর স্ত্রী একজন ইতালীয়। সুতরাং তাঁদের সন্তানের দেহেও কোন বুলগেরিয় রক্ত নেই। অবশ্য না থাকলেও তেমন আর কোন অসুবিধা নেই। কারণ বুলগেরিয়ায় এখন আর রাজতন্ত্র নেই, সেখানে স্থাপিত হয়েছে রুশমার্কা গণতন্ত্র অর্থাৎ People's Democracy.

সোফিয়া সহরটি একটি সমতল ভূমিতে অবস্থিত। অদূরে একটি সুন্দর পাহাড়। পাহাড়টির নাম ভিতোসা। পাহাড়ের নামানুসারে এই সমতল প্রস্তরটিরও ঐ একই নামাকরণ হয়েছে।

দেখতে সহরটি যা-ই হোক, ইহার গল্পগাথায় প্রাচীন ইতিহাসের পৃষ্ঠা ভারাক্রান্ত হয়ে আছে। প্রায় বাইশ শত

বৎসর পূর্ব্বেও ইহার যে অস্তিত্ব ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। পরবর্ত্তীকালে নানা রোমাঞ্চকর ঘটনা এখানে সংঘটিত হয় এবং বহুবার বহুভাবে ইহার ভাগ্য বিপর্য্যয় ঘটে। অবশ্য বিভিন্ন সময়ে ইহার বিভিন্ন নাম ছিল। ১৩২৯ খৃষ্টাব্দ হতে সোফিয়া নামে ইহার পরিচয় স্বরু হয়।

রোমের অধীনে, রুশদেশের জারের অধীনে এবং তুরস্কের সুলতানের অধীনে শতাব্দীর পর শতাব্দী এই দেশ শাসিত হয়। অবশেষে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর সোফিয়া তুরস্কের পরাধীনতা হতে মুক্তিলাভ করে, মুক্তিলাভ করে রুশদেশের রাজার সাহায্যে, অর্থাৎ রুশ ও তুরস্কের মধ্যে যে যুদ্ধ হয়, তাতে পরাজিত হয়ে তুর্কী সৈন্য পশ্চাৎপদ হলে রুশ সৈন্য এই সোফিয়া সহরে ঐ দিন প্রবেশ ক'রে অধিকার করে।

ঐ রুশ-তুরস্ক যুদ্ধে তুর্কী পরাজিত হলে যে সান ষ্টিফানো চুক্তি হয় (৩রা মার্চ্চ, ১৮৭৮), তাতে বুলগেরিয়ার স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়, অর্থাৎ দীর্ঘ পাঁচ শত বৎসরের পরাধীনতার অভিশাপ থেকে বুলগেরিয়ার মুক্তি ঘটল। সুতরাং যাঁর মহানুভবতায় এই দীর্ঘ অমানিশার শেষে স্বাধীনতার প্রথম অরুণোদয়ের পরম স্পর্শে বুলগেরিয় জাতি নবচেতনা লাভ করল, স্বভাবতঃই সেই রুশরাজ জার দ্বিতীয় আলেকজেন্দার বুলগেরিয়ার মানস লোকে এক পরমপুরুষের স্থলাভিষিক্ত হলেন। তাইত বুলগেরিয়ায় তাঁকে বলা হয় "মুক্তিদাতা জার (Tzar Liberator)।" তাঁর সঙ্গে তাঁর

দেশবাসীরাও সেদিন থেকে বুলগেরিয়দের শ্রদ্ধা ও প্রীতি লাভ করে আস্‌চে।

সান স্টিফানো চুক্তিতে বুলগেরিয়া যে স্বাধীনতা লাভ করল, বার্লিন চুক্তিতে (১৩ জুলাই, ১৮৭৮) তাহা নূতন আকার লাভ করল। আর তা' ঘটল স্বার্থান্বেষী শক্তিশালী পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির হস্তক্ষেপে। এই পরবর্ত্তী চুক্তি অনুসারে বুলগেরিয়া দেশটি তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়, যথা (১) মেসিডোনিয়া, (২) বুলগেরিয়া এবং (৩) থ্রেস্। মেসিডোনিয়া অঞ্চল পরাজিত সুলতানকেই প্রত্যর্পণ করা হল, অবশ্য নূতন শাসন সংস্কার সেখানে প্রবর্ত্তিত হবে এই প্রতিশ্রুতিতে। থ্রেসকে স্বায়ত্বশাসনাধিকার দেওয়া হল, তবে সেখানেও সর্ব্বোচ্চ শাসনকর্ত্তা একজন খৃষ্টান নিযুক্ত হবে—এই প্রতিশ্রুতিতে সুলতান আবদ্ধ রইলেন। আর খর্ব্বাকৃতি বুলগেরিয়া অঞ্চল স্বাধীন হল, তবে ইহাকেও সুলতানের আনুগত্য নামে মাত্র স্বীকার করতে হত। এই অপমানজনক অবস্থার অবসান ঘটে ১৯০৮ সনের অক্টোবর মাসে। ঐ সময়ে বুলগেরিয়ার রাজা ফার্দিনান্দ সুলতানের আনুগত্য অস্বীকার ক'রে বুলগেরিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

কয়েক বৎসর পর ১৯১২ খৃষ্টাব্দে তুরস্কের সঙ্গে বুলগেরিয়ার যুদ্ধ ঘটে। সেই যুদ্ধে গ্রীস এবং সারবিয়াও বুলগেরিয়ার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। ফলে তুরস্কের পরাজয় ঘটে। কিন্তু পর বৎসর (১৯১৩) বুলগেরিয়াকে আর একটি

যুদ্ধ করতে হল। এই যুদ্ধ করতে হয় প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহ অর্থাৎ গ্রীস, রুমানিয়া ও সার্ব্বিয়ার সঙ্গে। শক্তিশালী বিপক্ষ দলের নিকট বুলগেরিয়া পরাজয় স্বীকার করল। আর তাতেই এর জের মিটল না। কিছু অঞ্চলও তা'কে ছাড়তে হল।

এর কিছুদিন পরই প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়। বিগত পরাজয়ের গ্লানি হতে মুক্ত হতে, আর হস্তচ্যুত অঞ্চলগুলি পূনর্দখলের আশায় মহাযুদ্ধে বুলগেরিয়া জার্ম্মানীর পক্ষ অবলম্বন করল। কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হয়ে গ্রীস এবং যুগোশ্লাভিয়াকে মেসিডোনিয়ার অঞ্চল বিশেষ হস্তান্তর করতে বুলগেরিয়া বাধ্য হল।

তারপর দেশের অভ্যন্তরেও সম্পূর্ণ শান্তি বলতে যা' বুঝায়, তা কোন দিন দেখা গেল না, রাজনৈতিক অশান্তি লেগেই রইল।

গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এই দেশটি প্রথমে জার্ম্মান আক্রমণে, পরে রুশ আক্রমণে জার্ম্মাণ বিতারণে বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একেই ত দেশটি ছোট আর অনগ্রসর, তদুপরি যুদ্ধের বিপুল ক্ষয় ক্ষতি। সুতরাং এই দেশের অবস্থা যা, কল্পনা করাই কঠিন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে এই দেশের ব্যবসা বাণিজ্য ও রাজনৈতিক ভাবধারায় জার্ম্মানীর প্রভাব ছিল বেশী, যেমন যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে ইহার বৈদেশিক বাণিজ্যের এক বিপুল অংশ অর্থাৎ ৬০ ভাগই ছিল জার্ম্মানীর সঙ্গে, তৎপরই ছিল ব্রিটেনের, কিন্তু মাত্র ১২ ভাগ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্ম্মানীর পরাজয়ে সেই স্থান রুশরা গ্রহণ করল। এখন বুলগেরিয়া প্রতিবেশী শক্তিশালী রাষ্ট্র রুশের সম্পূর্ণ প্রভাবাধীন। না হয়ে বোধ হয় উপায়ও নেই। আয়তন এবং অবস্থানের গুরুত্ব অথবা জনবল, অর্থবল বা সামরিক প্রস্তুতির বিবেচনায় বল্কানের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির কা'রো পক্ষেই সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকা সম্ভব নয়, কা'রো না কা'রোর প্রভাবধীন থাকতেই হবে। তা' ছাড়া বুলগেরিয়ার দুর্ভাগ্য— প্রতিবেশী কোন রাষ্ট্রের সঙ্গেই তার তেমন মিল নেই, দোষ যারই হোক। সর্ব্বদাই যেন সে সপ্তরথী পরিবেষ্টিত অবস্থায় আছে। এর প্রধান কারণ—বল্কান যুদ্ধে বা প্রথম মহাযুদ্ধে পরাজয়ের ফলে এই দেশের যে সকল অঞ্চল অঙ্কচ্যুত হয়েছিল, সেই সকল অঞ্চল পুনরুদ্ধারে বুলগেরিয়ার অবিরাম আন্দোলন ও চেষ্টা। এই আন্দোলনে বা চেষ্টায় প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির বিশেষতঃ গ্রীস, যুগোশ্লাভিয়া ও রুমানিয়ার আঁতে ঘা লাগে। কারণ ভূমধ্যসাগরে যাবার প্রধান বন্দর সালোনিকা সহ মেসিডোনিয়া অঞ্চল, যা গ্রীস এবং যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে, বুলগেরিয়া দাবী করে। সে-দাবীতে ঐ দুটি দেশই সমানভাবে বিব্রত। বুলগেরিয়া দাবী করে দব্রুজা অঞ্চল যা রুমানিয়ার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। তুরস্কের বিরুদ্ধেও বুলগেরিয়ার আঞ্চলিক দাবী আছে। বুলগেরিয়ার ক্ষোভ যে, যুদ্ধে পরাজয় জনিত দুর্ভাগ্যের সুযোগে তার অঞ্চলগুলি ছিন্ন করে নেওয়া হয়েছে, যদিও অধিবাসীরা অধিকাংশই বুলগেরিয়।

কেবল যে কলেবর বৃদ্ধির জন্যই বুলগেরিয়া ঐ অঞ্চলগুলি দাবী করে, তা নয়। বস্তুতঃ বুলগেরিয়ার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য ঐ সকল অঞ্চলগুলিতেও স্থানীয় অধিবাসীদের আন্দোলন লেগেই আছে।

কিন্তু নানা অজুহাতে বিভিন্ন রাষ্ট্র বুলগেরিয়ার দাবী গ্রহণযোগ্য মনে করে নাই, পূর্ব্বেও করে নাই, এখনও না। কথায়-ই বলে চোরে চোরে মাসতুতো ভাই। প্রচলিত এই প্রবাদবাক্য বুলগেরিয়ায় প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি সম্বন্ধে বেশ ভালোভাবেই প্রযোজ্য হয়।

বুলগেরিয়ার ঐ আঞ্চলিক দাবীর প্রতি সঙ্ঘবদ্ধ বিরোধিতাই শুধু নয়, প্রয়োজনবোধে যুদ্ধও করা হবে—এমন একটা গোপন চুক্তিতে বুলগেরিয়ার প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহ অর্থাৎ যুগোশ্লাভিয়া, রুমানিয়া, গ্রীস এবং তুরস্ক আবদ্ধ হয়েছিল। ইহা ১৯৩৪ সনের ৯ই ফেব্রুয়ারীর ঘটনা। তারপর বহু রকমের বহু ঘটনা ঘটেছে, বিশেষতঃ একটি ভয়ঙ্কর মহাযুদ্ধ এই অঞ্চলের উপর দিয়ে চলে গিয়েছে। ফলে যুদ্ধ পূর্ব্বের অবস্থা বর্ত্তমানে নূতন আকার লাভ করেছে অর্থাৎ এই বল্কান অঞ্চল দ্বিধা বিভক্ত হয়ে বিশ্বের দুইটি প্রধান শক্তিগোষ্ঠির অঙ্কাশ্রয় নিয়েছে। রুশ প্রভাবাধীনে আছে এ্যালবেনিয়া, বুলগেরিয়া এবং রুমানিয়া অর্থাৎ প্রায় দুই কোটি চল্লিশ লক্ষ অধিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল। অপর দিকে এ্যাংগ্লো আমেরিকার প্রভাবাধীনে রয়েছে তুরস্ক, গ্রীস এবং যুগোশ্লাভিয়া অর্থাৎ প্রায় চার কোটি লোক

অধ্যুষিত অঞ্চল। ফলে যুদ্ধ পূর্ব্বে বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে যে চুক্তি হয়েছিল, পরিবর্ত্তিত অবস্থায় তার এখন কোন মূল্যই নেই। অথবা ঘুরিয়ে বললে, স্থানীয় সমস্যা আর মোটেই স্থানীয় নেই। এখানে জবরদস্তি করলে একটি বিশ্বযুদ্ধের ঝুঁকিও নিতে হয়। কিন্তু রুমানিয়ার দব্রুজা অঞ্চল ত বুলগেরিয়া ফেরৎ পেতে পারে। তা'তে ত আর বিশ্বযুদ্ধ বাঁধবে না, যেমন ইতালীর অন্তর্ভুক্ত ত্রিয়েস্ত নগরী যুগোশ্লাভিয়ার অন্তর্ভুক্ত হলে কোন বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা নেই। কিন্তু তা'ও হবার যো নেই। কারণ রুমানিয়া ও বুলগেরিয়া—এই দুইটি দেশের মধ্যে রুশ দেশের নিকট রুমানিয়ার তৈল বেশী অত্যাবশ্যক এবং জনবল, অর্থবল, সম্পদ সকল দিক থেকেই রুমানিয়ার সাহায্য ও সহযোগিতা বুলগেরিয়ার তুলনায় রুশ দেশের পক্ষে বেশী প্রয়োজন। সুতরাং বুলগেরিয়ার যুক্তি যতই প্রবল হোক, রুমানিয়াকে চটানো বা অসন্তুষ্ট করা রাশিয়ার ইচ্ছা নয়। তাই দব্রুজা অঞ্চল আজও রুমানিয়ার দখলে।

রুমানিয়া অবশ্য জনসংখ্যা দেখিয়ে প্রমাণ করতে চায় যে তাদের লোকসংখ্যাই সেখানে সর্ব্বাধিক। সুতরাং ঐ অঞ্চল তাদেরই অধিকারভুক্ত থাকা উচিত। বুলগেরিয়া অবশ্য ঐ সংখ্যাতত্ত্বই খানিকটা অস্বীকার করে। রুমানিয়ার সংখ্যানুযায়ী এই অঞ্চলে দেখা যায়—৩লক্ষ ৬০ হাজার রুমানিয়, ১লক্ষ ৮৫ হাজার বুলগেরিয়, ১ লক্ষ ৫০ হাজার তুর্কী এবং ৮ লক্ষ ১৩ হাজার অবশিষ্ট লোক অর্থাৎ গ্রীক, জার্ম্মাণ, রুশিয় প্রভৃতি।

এক কথায়, জনসংখ্যায় এই অঞ্চল একটি জগাখিচুড়ি বিশেষ। মাইনোরিটির স্বার্থ বিপন্ন—এই ধূঁয়া তুলিয়া এখানে যে কোন গোলমাল সৃষ্টির অবকাশ রয়েছে। এই বল্কান অঞ্চলের প্রায় প্রতিটি দেশেই জটিল এই মাইনোরিটি সমস্যা রয়েছে। তাই ত ইউরোপের রাজনীতি-ক্ষেত্রে বল্কান অঞ্চল একটি Cockpit বিশেষ।

বুলগেরিয়া দেশটি আতর আর আঙ্গুরের দেশ বলেও খ্যাত। এখানকার গোলাপ ফুলের আতর ইউরোপ ও আমেরিকার সর্ব্বত্র রপ্তানি হয়। আঙ্গুরও বিভিন্ন দেশে প্রচুর পরিমাণে চালান হয়। আঙ্গুর এখানে সস্তাও খুব। আধ সের আঙ্গুরের দাম আমাদের দু' আনার মত। অবশ্য আরবের আঙ্গুরের তুলনায় ইহা অত উৎকৃষ্ট নয়।

গোলাপ ফুল এখানে আমাদের দেশের মত বাগানের শ্রীবৃদ্ধি করে না বা মনমাতানো সুবাসও ইহার নেই। বস্তুতঃ এখানকার গোলাপে কোন সুবাস নেই, দেখতেও ছোট ছোট, তবে হয় প্রচুর। অর্থাৎ কৃষ্টিপণ্যের মতই ইহার চাষ হয় এদেশে। গাছগুলি হয় ছোট ছোট। শুনেছি, ঐ গোলাপ ফুলগুলি ভিজিয়ে রাখলে নাকি সুবাস বেরোয়।

সারা সকাল সহর দেখে মধ্যাহ্নে একটি রেস্তরাঁয় ঢুকলাম। এই দেশেও রান্নাবাড়িতে কাঁচা লঙ্কার ব্যবহার হয় খুব।

কিছুক্ষণ বাদে দুজন ভদ্রলোক এসে আমার পাশে আমার টেবিলেই বসলেন। একজন বিদেশীকে দেখে বোধ হয় তাদের

খানিকটা কৌতূহলও হয়েছিল। তাদের সেই কৌতূহলের পরিসমাপ্তি ঘটে আমার সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্নে। এই ভাবেই আমাদের আলাপের সূত্রপাত হল। ভদ্রলোক দুই জনের মধ্যে একজন ছিলেন মিশনারী, বয়স চল্লিশের মত, চোখে মুখে তাঁর বুদ্ধির দীপ্তি, সেবা-ভাবে উদ্দীপ্ত। অপরজন ছিলেন একজন ডাক্তার, নাম টস্‌কভ্‌।

কথায় কথায় তাঁরা জেনে আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন যে আমি বিয়ার খাই না, আর শুধু আমিই নই, আমাদের দেশে ইহা কেহ খায় না। 'তবে আপনারা পান করেন কি ?'—উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন তাঁরা। আমি উত্তর করলাম—'পানীয় অর্থে আমরা জল বুঝি, যেমন আপনারা বিয়ার বোঝেন।" আমার উত্তর শুনে তাঁরা হেসে উঠলেন। হাসির শব্দে সারা ঘরখানার অন্যান্য লোকজনের দৃষ্টিও আমাদের দিকে আকৃষ্ট হল। তাদেরকেও যখন হাসির কারণ বলতে গিয়ে তারা বললেন যে, ভারতের লোকেরা বিয়ার পান করে না, পান করে স্রেফ জল, তখন তারাও সকলে হেসে উঠল, যেন তারা ভাবতেই পারল না যে, কি ক'রে লোকে পানীয় হিসাবে বিয়ার না খেয়ে থাকতে পারে। (অবশ্য আমরাও ত ঐরূপই ভেবে আশ্চর্য্য হই যে কি করে ছেলে বুড়ো ইউরোপের সকলে বিয়ার খায়। মদ কথাটিই আমাদের বহু অসন্তোষের কারণ হয়, আর ইহার ব্যবহার যে করে, আমাদের চোখে নৈতিক অধঃপতনের দোষে হয় সে দুষ্ট, লোকসমাজে হয় সে ধিক্কৃত। মদ বলতে যা

বুঝায়, বিয়ার অবশ্য তা' নয়। উহাতে শতকরা ৫ থেকে ১০ ভাগ এর মধ্যে মদ জাতীয় উত্তেজনাকর জিনিষ থাকে। সুতরাং বিয়ার খেলে মদের নেশা হয় না, যদিও আমার নিজের অভিজ্ঞতা এ বিষয়ে বিশেষ কিছু নেই)।

এতক্ষণে আলাপ আলোচনায় আমরা বেশ খানিকটা বন্ধুত্ব জমিয়ে ফেলেছিলাম। যেহেতু আমি বিয়ার পান করি না, সেহেতু নিষিদ্ধ এই বস্তুটি আমার গলাধঃকরণ না করিয়ে তাঁরা ছাড়বে না—এমনই যেন তাঁরা প্রতিজ্ঞা করে বসলেন, তাঁদের ব্যবহারে অন্ততঃ তাই মনে হল। অনেক অনুরোধ হল। অবশেষে তাঁদের বাধিত করতে আমি স্বীকৃত হলাম। মুখে এক চুমুক নিয়ে বন্ধুদ্বয়ের অনুরোধ রক্ষা করলাম, অনুরোধে যেন ঢেঁকি গেলা হল। আমার জীবনে উহাই প্রথম ও শেষ অভিজ্ঞতা। ওদের মত আমি এখনও ভাবি—বিয়ার খায় কি? তেঁতো, বিস্বাদ একটা পানীয় খেয়ে লাভ কি? অবশ্য আবহাওয়া ভেদে খাদ্য ও পানীয়েরও পরিবর্ত্তন হয়)।

খাওয়া শেষ হল। বিলের পয়সা দিয়ে দেবার জন্য মনি-ব্যাগ বের করেছি, এমন সময়ে শুনলাম যে বন্ধুদ্বয়ের একজন (ডঃ টসকভ) আমার বিল পরিশোধ করে দিয়েছেন। অনেক অনুরোধ করলাম, কিন্তু পরিচারিকা আমার খাদ্য বাবদ কোন মূল্য গ্রহণ করতে রাজী হল না। আমি ডঃ টসকভকে ইহার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন—"আপনি আমাদের দেশে এসেছেন, আমাদের সঙ্গে আপনার পরিচয়ও হয়েছে। আপনাকে

আমরা দেশের একজন সম্মানীয় অতিথি বলেই মনে করি। তাই আমাদের সম্মুখে আপনি খাবার পয়সা দিলে আতিথেয়-তার অসম্মান করা হয়, উহার কোন অর্থই আর থাকে না।" তিনি আরও বললেন—"আমরা যখন আপনাদের দেশে যাব, তখন আপনারাও নিশ্চয়ই এইরূপ আতিথেয়তা-ই দেখাবেন।"

রেস্তরাঁ থেকে বাইরে এলে ডঃ টসকভ বৈকালে তাঁর বাড়ীতে আমাকে চায়ের আমন্ত্রণ জানালেন। রাজী হয়ে তখনকার জন্য আমি বিদায় গ্রহণ করলাম।

অপরাহ্ন। চায়ের আমন্ত্রণ রক্ষায় রওনা হলাম। সহরের প্রধান রাস্তা পিরোটস্কা। এই রাস্তায়-ই ডঃ টসকভের বাসা, বাসা কি বাড়ী, মনে নেই, তবে ঐ বাড়ীতে অন্য কেউ আর থাকত না।

বাড়ীর সদর দরজায় আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলেন ডঃ টসকভ, তাঁর অন্য আর একজন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে।

বাড়ীর দরজায় এসে পৌঁছতে না পৌঁছতেই বন্ধুসহ ডঃ টসকভ এগিয়ে এলেন আমাকে সাদর অভ্যর্থনা করবার জন্য। আমাকে তাঁরা বৈঠকখানায় নিয়ে গেলেন।

ঘরখানা বেশ সাজানা গোছানো। এখানে বাড়ীর সকলের সঙ্গে আমার পরিচয় হল, ডাক্তারের মা, বোন, স্ত্রীর সঙ্গেও। অবশ্য পরিচিত হল ডাক্তারের মারফৎ। তিনিই করলেন দোভাষীর কাজ। পরস্পরের মধ্যে

আলাপে যে হৃদ্যতা জমে, যে আনন্দ পাওয়া যায়, অন্য আর একজনের মাধ্যমে অর্থাৎ দোভাষীর মারফৎ কথাবার্ত্তায় আনন্দের বেশীর ভাগটাই পাওয়া যায় না। তা' পূর্ব্বেও যেমন বোধ করেছি, এখনও তেমনই করলাম। অবশ্য ইহা ছাড়া উপায়ও নেই।

চা খেতে বসলাম, কিন্তু প্রথমেই পেলাম একটি ছোট্ট কাপে এক কাপ জ্যাম (মিষ্টি আচার) আর জল।

বুলগেরিয়ায় অতিথি সৎকারের পদ্ধতিটি ভারতীয় বিশেষতঃ বাঙ্গালী ধরণের। আজকাল কলকাতায় বন্ধুবান্ধব বা অতিথি অভ্যাগতদেয় চা দিয়ে প্রথমে অভ্যর্থনা করলেও মিষ্টি দিয়ে অভ্যর্থনা করবার রেওয়াজই বেশী। বুলগেরিয়া সমেত এই বল্কান অঞ্চলেও এই রীতি। প্রথমেই মিষ্টি দিয়ে অভ্যর্থনা, পরে চা বা কফি। অবশ্য চা এদেশে কেউ বিশেষ খায় না, এদেশে চলে তুর্কী কফি। তুর্কী কফির নামে অনেকেই হয়ত আশ্চর্য্য হয়ে ভাববেন—সে আবার কি? কিন্তু সত্যই কফিতে কফিতে তফাৎ অনেক। আমাদের দেশে কফি যে অঞ্চলে চলে বেশী (বাংলা দেশে কফি খুব কম লোকেই খায়), সেই দক্ষিণ ভারতে এই কফি প্রস্তুত হয় চায়ের মত তরল, অনেক দুধ দিয়ে। (আমার নিজের মতে—চা অপেক্ষা কফি খেতে অনেক ভাল।) কিন্তু যে তুর্কী কফির কথা বললাম, সেই কফি প্রস্তুত হয় খুব ঘন, আর দুধ ছাড়া এবং তা খায় চীনা মাটির ছোট্ট বাটিতে (আধ ছটাক ধরে এমন বাটি)।

এইরূপ আতিথেয়তার ধরণ থেকে বা রান্নাবাড়ি, খাওয়া-দাওয়া, চালচলন—সকল কিছুতেই এদেরকে এশিয়াবাসী বলেই মনে নয়। অবশ্য তাদের আদি বাস ত এশিয়ারই অন্তর্গত ছিল অর্থাৎ আজব সাগরের পারে এদের বাস ছিল। কিন্তু অত পুরানো কালের কথা টেনে এনে এখন কোন লাভ নেই। সেই সুদূর অতীতের তেমন কোন প্রভাব এখন এদের উপরে আর নেই। তুরস্কের অধীনে শত শত বৎসর পরাধীন থাকায় তুর্কী প্রভাবেই এদের জীবনযাত্রা বর্ত্তমানে এশিয়াবাসীর মত মনে হয়।

দিনটির আবহাওয়া মোটেই ভাল ছিল না, আরামদায়ক তো নয়ই। মেঘ ভারাক্রান্ত আকাশ, মাঝে মাঝে টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছিল।

চায়ের টেবিলে কিছুক্ষণ গল্প গুজবে কাটিয়ে প্রথমে মেয়েদের, তৎপরে অন্যদের নিকট বিদায় গ্রহণ করলাম।

আমাদের দেশে চলা ফেরায় বা সামাজিক রীতিনীতিতে পুরুষরা চলে অগ্রে, মেয়েরা পশ্চাতে। কিন্তু ইউরোপে চলে মেয়েরা অগ্রে, পুরুষরা পশ্চাতে। যেমন কোন ঘরে দরজা ঠেলে প্রবেশ করতে হলে আমাদের দেশে পুরুষরাই প্রথমে প্রবেশ ক'রে পথ মুক্ত ক'রে রাখে, কিন্তু ইউরোপের পুরুষরা দরজা খুলে পথ মুক্ত ক'রে রাখে সঙ্গীনীদের প্রথম প্রবেশের জন্য। এইভাবে ইউরোপে মেয়েদেরকেই অগ্রাধিকার দেওয়া

হয়, যদিও তারা আমাদের দেশের তুলনায় খুব বেশী যে স্বাধীনতা ভোগ করে, তা নয়।

বাড়ীর বাইরে এসে একটা ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করা হল। ডঃ টসকভও আমার সঙ্গী হলেন। তিনি এবার আমাকে নিয়ে চললেন তাঁর বন্ধু দেশের এক প্রধান ভাস্কর-শিল্পীর বাসায়। সেখানে বিশ্ববিত্থালয়ের কয়েকজন অধ্যাপকও এসে আমার অপেক্ষায় বসে ছিলেন। সময় মতই আমরা সেখানে পৌছলাম। অভ্যর্থনায় কোন ত্রুটি ছিল না, বরং হৃদ্যতাই বেশী প্রকাশ পেল।

দুঃখের বিষয় যারা ওখানে ছিলেন, কেউ-ই তাঁরা ইংরাজী জানতেন না। স্বভাবতঃই এখন ডাক্তারকেই আমাদের দো-ভাষীর কাজ করতে হল। কথায় কথায় তাঁরা বললেন যে, আমি ছাড়া আর কোনও ভারতবাসীর সঙ্গে তাঁদের কখনও দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। ভূগোল ইতিহাস বা অন্তান্য বইএর মারফৎ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছু জেনে থাকলেও কোন ভারতবাসীর মারফৎ ভারতবর্ষকে জানার সুযোগ তাঁরা কখনও পান নি। স্বভাবতঃই আমার জানতে কৌতূহল হল যে, ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী সম্বন্ধে কোন্ কোন্ বই তাঁরা পড়েছেন। এ সম্পর্কে আমার এক প্রশ্নের উত্তরে একজন প্রোফেসার বলে উঠলেন যে, মিস্ মেয়োর একখানা বই তিনি পড়েছেন। আরও জানালেন তিনি যে, ঐ বইখানা তাঁদের দেশে বহুল প্রচারিত হয়েছে। শুনে আমার মনটা গেল খারাপ হয়ে, না হবেই বা

কেন ? একটা দেশ সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকা মোটেই দোষের নয়, কিন্তু এই ধরণের বই পড়লে একটা জাতি সম্বন্ধে যে ভুল ধারণা একবার জন্মে, তা পরে শত প্রচারেও আর যেতে চায় না। শুনে দুঃখিত হলাম যে আমাদের দেশ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য হিসাবে ঐ বইখানাই সেদেশে বিশেষ সমাদর লাভ করে। মিস্ মেয়োর নাম শুনেই আমি আঁতকে উঠেছিলাম। আমার তখন মনে পড়ে গেল মিস্ মেয়োর সম্বন্ধে গান্ধীজীর সেই সংক্ষিপ্ত মন্তব্যটুকু—'নর্দমা পরিদর্শিকা'—যে কথার বর্ণে বর্ণে বিদ্রোহী ভারতের মর্ম্মবাণী ধ্বনিত হয়েছিল ।

বইখানা আর লেখিকার নাম শুনে আমি কেন ভ্রূকুঞ্চিত করলাম—তা প্রোফেসার ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে আমি শুধু বইটি ও লেখিকা সম্বন্ধে গান্ধীজীর ঐ ছোট্ট মন্তব্যটুকু জানালাম। তাতেই যেন টনিকের ফল হল। তাই তিনি পরক্ষণেই জিজ্ঞেস করলেন—"আপনাদের দেশ সম্বন্ধে তবে ভাল দু-একখানা বই-এর নাম করুন। সত্য কথা বলতে, বিদেশী লেখকের বই হলেই ভাল হয়। কারণ আপনাদের কথা আপনারা ত ভাল বলবেনই, আপনাদের দোষ ক্রটিও তেমন প্রকাশ করবেন না।" "বিদেশীর চোখে ভারতের একটা নিখুঁত ছবি যদি আপনি দেখতে চান ত পড়ুন জে-টি-সুণ্ডারল্যাণ্ডের 'দাসত্ব শৃঙ্খলে ভারত' (India in Bondage)। বইটি অবশ্যই রাজনৈতিক। তা হলেও ভারতকে যদি জানতে বুঝতে হয়, তবে রাজনৈতিক ভারতের কথা অগ্রে আপনাদের

জানতে বুঝতে হবে। তবেই ভারতের অন্যান্য সমস্যার কথাও আপনাদের জানতে সুবিধে হবে।”—আমি উত্তর করলাম।

একজন বলে উঠলেন—“হ্যাঁ, ভারতের নামে আমাদের কেবল হাতী, সাপ আর সাধুর আধিক্যের কথাই মনে হয়। অবশ্য শ্রদ্ধেয় বরেণ্য দু-একজন মনীষীও যে আপনাদের দেশে আছেন, তা'ও আমরা জানি।” আমি উত্তর করলাম—“দেখুন, জঙ্গল থাকলেই জন্তু থাকে, না থাকাটাই অস্বাভাবিক। আপনি যে সকল নাম করলেন অর্থাৎ হাতী, সাপ আর সাধু, সত্যই কোনটারই অভাব নেই আমাদের দেশে। আর আছে'র তালিকা ঐখানেই শেষ হয় না। আপনার ঐ তালিকা বহির্ভূত আরও অনেক কিছু আছে যা জানলে পৃথিবীর যে কোন হৃদয়-বান মানুষ বিস্ময়ে অভিভূত হবেন। আপনি যে হাতীর কথা বললেন, সেই হাতীই আমার মতে ভারতের সত্যকার প্রতিচ্ছবি, অর্থাৎ শক্তিশালী অথচ নম্র ভদ্র বুদ্ধিমান এবং সহিষ্ণু, এক কথায়—মহৎ। হাতীর চোখ যেমন ছোট্ট, তেমনই ভারতের বহির্দৃষ্টি কম, অন্তর্দৃষ্টি গভীর। হাতীর শ্রবণ ইন্দ্রিয় বড়, কিন্তু মুখে শব্দ হয় কম, তেমনই ভারত শ্রবণ করে সব, আত্মস্থও করে, কিন্তু নিজের গুণের কথা মুখে প্রকাশ করে কম অর্থাৎ ঢাক পিটানোর অভ্যাস কম। নিজের ঢাক পিটানোর অভ্যেস কম বলেই মুখর যে, চতুর যে, সে ঐ সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে।”

"অবশ্য দোষ যে আমাদের নেই, তা নয়। বরং সত্য কথা বললে, দোষ আমাদের যথেষ্টই আছে, দোষ না থাকলে কি আমরা এতকাল বিদেশীর শাসনাধীন থাকি? তবে বিগত কাহিনীর দোষ গুণ এখন বিচার করে তেমন কিছু লাভ নেই।"

এক ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন—"আচ্ছা, ব্রিটিশ শাসন কি সত্যিই খারাপ?" পরমুহূর্ত্তে নিজেই তুর্কী শাসনের কথা বলতে গিয়ে বল্লেন, "আমরাও ত কয়েকজনের অধীনেই ছিলাম, কিন্তু তুর্কী শাসকের মত এত খারাপ বোধ হয় পৃথিবীতে আর হয় না।"

আমি উত্তর করলাম—"যে যার অধীনে থাকে, সে-ই হাড়ে হাড়ে বোঝে—পর-শাসন, পরাধীনতা কত মধুর। আমার কাছে —শাসকের কোন জাত বিচার নেই, শাদা কালো নেই, সকলেই সমান নিষ্ঠুর। তবে তফাৎ এই যে অন্যের তুলনায় ব্রিটিশ একটু বেশী বুদ্ধিমান, প্রচারের মূল্য সে বোঝে। তাই বিশ্বে তার বিরাট প্রচারকার্য্য চলে, অর্থাৎ এক কথায়— ইংরাজরা বিরাট ধাপ্পাবাজ লোক। স্বার্থের জন্য সকলেই পরকে শাসন এবং শোষণ করে, ইংরাজও করে। যেদিন ইংরাজের এই শোষণ করা বন্ধ হয়ে যাবে, সেদিন আর ইংরাজের কোন আভিজাত্য থাকবে না, অতি সাধারণ একটি জাতিতে সেও পরিণত হবে।"

"তবে হ্যাঁ, যদি কোন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির শোষণ প্রণালীকে প্রশংসা করতে হয়, তবে অবশ্যই সেই প্রশংসা সর্ব্বাগ্রে ইংরাজের প্রাপ্য।"

"ইংরাজের অধীনে যদি ভারত না থাকত, তবে কি ভারত এমন ঐক্যবদ্ধ হত ?"—অন্য একজন জিজ্ঞেস করলেন।

আমি উত্তর করলাম—"ইংরাজ না থাকলে কি হত, না হত, সেটা এখন বলা শক্ত। কারণ আপনি যেমন শতধা বিচ্ছিন্ন ভারতের কথা ভাবতে পারেন, তেমন ত আমি অখণ্ড বৃহত্তর এক ভারতের অভ্যুদয়ের কথাও কল্পনা করতে পারি এবং আমার এই কল্পনার পেছনে যুক্তি যত প্রবল, আবেগ যত প্রবল, আপনার ঐ খণ্ড বিচ্ছিন্ন ভারতের কল্পনার পেছনে তেমন প্রবল কোন যুক্তি নেই। অখণ্ড ভারত বা বৃহত্তর ভারতের কথা কবি-কল্পনা নয়। ইংরাজ আমাদের দেশে আসবার শত, সহস্র বৎসর পূর্ব্বেই উহা ছিল এবং আমাদের অধিকাংশ নেতা বা কর্ম্মীর সকল কাজে এখনও ঐ একটি প্রেরণাই কাজ করে বেশী। তাই আপনি বলতে পারেন না যে ইংরাজ না থাকলে আমরা ঐক্যবদ্ধ একটা জাতিতে পরিণত হতে পারতাম না। ইংরাজ ভারতে যা কিছু করেছে, তা তার নিজের দেশের জন্য, জাতির জন্য, আমাদের ভালভাবে শোষণের জন্য, আমাদের কোন মঙ্গলের জন্য নয়।"

"কেন, আপনারা কি কিছুমাত্রও উপকৃত হন নি ?"—অন্য আর একজন জিজ্ঞেস করলেন।"

আমি উত্তর করলাম—"বিন্দুমাত্র না। শুনে হয়ত আপনি অবাক হলেন। অবাক হবেন না, ফল দেখে বিচার করুন। ভারতে যান, দেখবেন—একদিনকার সম্পদশালী সোনার ভারত আজ এক ভিক্ষুকের দেশে পরিণত হয়েছে। সহরে যান, গ্রামে

যান, ট্রেনে যান, বাসে যান, যেখানেই যান, যেভাবেই যান, উলঙ্গ, কপর্দ্দকহীন ভিক্ষুকের দল এসে আপনাকে একটি কানা পয়সার জন্যও ঘিরে দাঁড়াবে। ইহাই ইংরাজ শাসনের চরম পরিণতি।"

"দেড় শত বৎসরের অধিক ইংরাজরা আমাদের দেশকে শাসন করল, কিন্তু মজার কথা এই যে এই দীর্ঘ শাসনের ফলে আমাদের দেশে শিক্ষার হার ত বৃদ্ধি পেলই না, বরং কমে এসে এক হাস্যকর সংখ্যায় দাঁড়াল। আধুনিক সভ্যতার ধ্বজাধারী এই ইংরাজ আমলেই রোগে শোকে দেশ আজ উজার হতে বসেছে। আর যে কয়টি ভাগ্যবান ইংরাজের শিক্ষা আয়ত্ব করার সুযোগ পেয়েছেন, তাঁরা অধিকাংশই হয়ে পড়েছেন আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর। সুতরাং ইংরাজ শাসনে আমাদের দেশের কোন দিক দিয়েই কোন লাভ হয় নি।"

"অবশ্য এ কথা নিশ্চয়ই আমি অস্বীকার করব না যে ভারতকে শোষণ করতে গিয়ে তারা মুষ্টিমেয় একদল প্রভুভক্ত ভারতীয়কেও কিঞ্চিৎ কৃপা করেছেন।"

"আপনার কথা শুনে ইংরাজ সম্বন্ধে আমাদের ধারণার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হল। এতদিন ভারত ছিল আমাদের কল্পনার একটা দেশ। কত রকমের কত বই প'ড়ে কত আজগুবি ধারণাই না ক'রে বসেছিলাম! কিন্তু আজ আপনার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে সত্যই আমরা খুব খুসী হয়েছি। আপনাদের

দেশে যাবার, গিয়ে চাক্ষুস সব দেখবার ইচ্ছা আমাদের আজ প্রবল হয়ে উঠেছে।”—প্রোফেসার ভদ্রলোক বলে উঠলেন।

আলাপ আলোচনা ক্রমেই রাজনৈতিক হয়ে উঠল। সুতরাং হালকা হাস্যরস সৃষ্ট হয়ে ঘরের আবহাওয়া আনন্দদায়ক হল না। তাই আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দিল একজন। এতে আমরা সকলেই যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

আসরে দু একটি ছেলে মেয়েও ছিল। একজনের এক ইসারায় একটি ছোট্ট মেয়ে উঠে গিয়ে পিয়ানোর ধারে বসল। তারপর পিয়ানোর ঐ মিষ্ট সুরে ঘরখানায় একটি নূতন আবেশের সৃষ্টি হল। ক্ষণেক পরে সেও তার সুমিষ্ট স্বরে ও সুরে গান ধরল। গানের ভাষা আমার বোধগম্য হল না বটে, কিন্তু সুর আর স্বরে আমিও বেশ আনন্দ উপভোগ করলাম।

গান শেষ হল ত নাচ আরম্ভ হল। নাচ করল একটি ছেলে, আর একটি মেয়ে, দুইটিই ছোট। নাচ হল অনেকক্ষণ. অনেকের বেশ ভালও লাগল, কিন্তু সত্য কথা বললে, আমার মোটেই ভাল লাগল না। পশ্চিমী নাচে আমি ভাবের অভিব্যক্তি দেখি কম। তা' হলেও আমাকে আনন্দদানের এই যে তাদের আন্তরিক চেষ্টা আর ক্লেশ স্বীকার, সেজন্য সত্যই আমি তাদের সকলের প্রতিই বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম।

বাদল রাত্রিতে এইরূপ আসর অনেকের নিকট বেশ ভালই লাগে, আমারও লাগল, বেশ উপভোগ্য হল।

রাত্রি অধিক হয়েছে। আসর ভেঙ্গে এখন আমরা উঠলাম। সকলকে প্রীতি সম্ভাষণ জানিয়ে, ছেলেমেয়েদের ধন্যবাদ জানিয়ে, সকলের সঙ্গে করমর্দ্দন করে আমি এখন বিদায় গ্রহণ করলাম। আমার সঙ্গে চললেন ঐ ডাক্তার আর প্রোফেসার সাহেব।

একটি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করা হল। এই গাড়ীতে তিনজনে উঠে চললাম আমার হোটেলে। বেশ খানিকটা দূর।

হোটেলে এসে গাড়ী থামল। আমি নামলাম, নেমে ডাক্তার এবং প্রোফেসার ভদ্রলোককেও নামতে অনুরোধ জানালাম।

আমার ঘরে ডাক্তার আর প্রোফেসার সাহেব এলে আমি মন্তব্য করলাম—"এতক্ষণ আমি ছিলাম আপনাদের অতিথি, এখন আপনারা আমার অতিথি। একটু কফি পান করুন।" ব'লে কফি আর কিছু খাবার আনতে হোটেলের ছোকরাকে ইসারায় বললাম। ছোকরাটি ভারি চালাক। মুখে চোখে হাসি নিয়ে সে আমাকে ইসারায় জিজ্ঞেস করল—"আমি বাদ যাব নাকি?" আমি অসন্তুষ্ট না হয়ে বরং খুসীই হলাম। তাকে জানালাম—"না, তুমিও বাদ যাবে না।"

খাওয়াদাওয়া শেষ করে একে অপরের করমর্দ্দন করে যখন আমরা বিদায় গ্রহণ করলাম, হোটেলের ঘড়িতে তখন ঠং ঠং

করে বারোটা বেজে উঠল। এত রাত হয়েছে দেখে ডাক্তার সাহেব বিদায় মুহূর্ত্তেও বলে উঠলেন—"আপনাকে ত আর পাব না। তাই আপনাকে খানিকটা কষ্ট দিলাম। অবশ্য নূতন জায়গায় আপনি ত রোজই নূতন!"

পরদিন সকালে চা খেয়ে সাইকেলে রওনা হলাম আশে-পাশের দু-একখানি গ্রাম দেখতে। সাইকেলের সাইনবোর্ডে আমার পরিচয় পেয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই দু-একজন সঙ্গী এসে জুটল। সকলেই তারা তরুণ, আমেরিকান কলেজের ছাত্র। যা ভেবেই এরা আমার সঙ্গ নিয়ে থাকুক, আমার ভালই হল। পথঘাট চিনতে আমার সুবিধে হল, দোভাষীর কাজে তাদের সাহায্যও পাওয়া গেল।

তখন আর ভোর নেই। সূর্য্য পুব আকাশের অনেকটা উপরে উঠেছে, রোদে চারিদিক ভরে গেছে। কেউ আর কোথাও বসে নেই, সকলেই যার যার কাজে লেগে গেছে। কৃষকেরা মাঠে মাঠে, আঙ্গুরের ক্ষেতে ক্ষেতে মন দিয়েছে।

একটি আঙ্গুর-বাগানে গেলাম। গুচ্ছ গুচ্ছ আঙ্গুর ফল ঝুলে রয়েছে। দেখে অমনি আমার মনে পড়ে গেল ইসপ্‌স-এর সেই আঙ্গুর আর খেঁকশিয়ালের গল্পটি। অবশ্য আশাভঙ্গ হ'য়ে ঐ গল্পে বর্ণিত খেঁকশিয়ালের মত আমাকে বলতে হল না যে আঙ্গুর বড় টক্! আমার আশা ভঙ্গ হওয়ার পূর্ব্বেই একজন বৃদ্ধ কৃষকের সঙ্গে আমার একজন সঙ্গীর আলাপ হল, আলাপ

হল, আমি কে এবং কোন্ দেশীয়, তা নিয়ে। পরক্ষণেই দেখলাম, একঝুড়ি আঙ্গুর তুলে এনে সহাস্যে এক অভিবাদন জানিয়ে সে আমার হাতে আঙ্গুরের ঝুড়িটি উপহার দিল। বলা বাহুল্য, এইরূপ আতিথেয়তায় আমি তাকে ধন্যবাদ জানালাম, তারপর তার সঙ্গে খানিকক্ষণ আলাপ করলাম, আলাপ হল তারই ক্ষেতের ফসল আর আঙ্গুরের দাম নিয়ে। কথায় কথায় সে জানাল—"ফসল ত হয় বেশ প্রচুর, কিন্তু মুস্কিল হয় তাজা ফল সংরক্ষণ নিয়ে। আমরা চাষ করি, কিন্তু ফল সংরক্ষণ আমরা করতে জানি না বা সে-ব্যবসা আমাদের নয়। তাই খরচ অনুপাতে আমাদের লাভ হয় কম। লাভ হয় তাদের, যাদের নিকট আমরা এগুলি বিক্রয় করি। তারা এই ফল সংরক্ষণ করে, আবার মদ এবং অন্যান্য জিনিষও তৈয়ারী করে। সে-সকল জিনিষ তো আর দুদিনেই নষ্ট হয় না। তাই তারা বিক্রয়ের সময় পায় বেশী। আর, তা ছাড়া তাদের বিক্রয়ের স্থানও বিরাট অর্থাৎ দেশে যা পারে বিক্রয় করে, বাদ বাকী দেয় তারা দেশে বিদেশে চালান। সুতরাং আমাদের পরিশ্রম নিয়ে তারা হয় বেশী লাভবান। আর যার জমি, যার মাল, সেই আমরা কৃষকরা আছি গরীব হয়েই।"

কথা শেষ হতে না হতেই আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবার ফুরসৎ না দিয়ে সে হাসিমুখে আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল—"আচ্ছা, আপনাদের দেশে কৃষকদের অবস্থা বুঝি খুব ভাল?" আমি জিজ্ঞেস করলাম—"বুঝলে কিসে?" উত্তর

হল—"আমাদের ধারণা। আমাদের মত দুরবস্থা যে আর কোন কৃষকের হতে পারে, তা ভাবতেই পারি না।" তার উত্তর শুনবার সঙ্গে সঙ্গে একবার তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে নিলাম, দেখলাম আমাদের কৃষকে আর এদের মধ্যে তফাৎ কতটা। এতে কোনই সন্দেহ নেই যে বুলগেরিয়ার কৃষক সারা ইউরোপের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দরিদ্র। তা হলেও আমাদের কৃষকদের সঙ্গে এদের তুলনা কোথায়?

পোষাক পরিচ্ছদে কোথাও এদের অভাব চোখে পড়ে না, হৃষ্টপুষ্ট চেহারায়ও না। বাড়ীঘরগুলিরও দেয়াল ইটের, চাল টালির। কিন্তু আমাদের দেশে শতকরা যে ৭০ জন চাষী, তাদের কজনের বাড়ীতে ভাল ঘর আছে, দালান ত দূরের কথা? আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কজনের বাড়ীতেই বা দালান রয়েছে?

কৃষকটি আমার উত্তর শুনবার জন্য যেন উদ্‌গ্রীব হয়েছিল। হয়ত সে ভেবেছিল যে আমি বলব—"হ্যাঁ, আমাদের কৃষকরা বড়ই সুখে আছে, দালানকোঠায় স্বাস্থ্য সম্পদে বড়ই তারা সুখী।" কিন্তু আমি ঐ কৃষককে উত্তর দেব কি, ভেবেই পেলাম না। তা' হলেও সে আমাকে রেহাই দিল না। উত্তর দিতে দেরী দেখে সে আমাকে জিজ্ঞেস করল—"কৈ বল্লেন না ত, আপনাদের দেশে কৃষকদের অবস্থা কিরূপ?" আমি উত্তর করলাম—"না, আমাদের কৃষকদের অধিকাংশই দুবেলা পেট ভরে খেতে পায় না। না খেলে কি আর স্বাস্থ্য ভাল থাকে?

তাই স্বাস্থ্যও তাদের দিন দিনই খারাপ হচ্ছে। তারপর বাড়ীঘরগুলিও আপনাদের তুলনায় বাসের অযোগ্য। অধিকাংশেরই বাড়ী আছে বটে, তবে ঘর নেই বললেই চলে। এমন ঘর যে জল ঝড় রোদ সমানভাগেই তারা ভোগ করে।” শুনে যেন তার খুব দুঃখ হল। সে তাই জিজ্ঞেস করল—“আচ্ছা, সরকার বাহাদুর তাদের এই সব অভাব অভিযোগের কিছু প্রতিকার করে না?” আমি বলতে যাব, কিন্তু বলবার আগেই তীব্র এক অপমান এবং লজ্জায় যেন আমি অধোবদন হলাম, তবুও শেষ পর্য্যন্ত বলে ফেললাম—“আমরা এখনও তো স্বাধীন হতে পারিনি। ইংরাজ আমাদের সরকার বাহাদুর। তারা আমাদের কৃষকদের সুখ দুঃখের কথা ভাববে কেন? তাদের যত কিছু দরদ, যত কিছু আনুগত্য, তা তো সব তাদের দেশের জনগণের প্রতি। তাই আমাদের কৃষক অবহেলিত। আমাদের সকলকে শোষণ করেই ত ইংরাজের এত সম্পদ, এত আভিজাত্য। আমাদের দেশের সকল শক্তি সম্পদ শোষণ করেই ত ইংরাজের পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছে, তার এত দাপট।”

‘কিন্তু আমরা যে শুনি’—বলতে বলতে সে আমার সঙ্গীদের দিকে একবার চাইল।

সঙ্গে সঙ্গে আমার জানবার কৌতূহল হল যে আমাদের দেশ সম্বন্ধে কি সে জানে, আর ইংরাজ সম্বন্ধেই বা কি সে শোনে। তাই আমিও মুহূর্ত্ত দেরী না করেই তাকে জিজ্ঞেস করলাম—“কি শোন?”

তদুত্তরে কৃষকটি বলল—“বাবুদের মুখে শুনি, ইংরাজের মত এত বড় একটা জাতিই আর পৃথিবীতে নেই।”

আমি জিজ্ঞেস করলাম—“কোন্ কোন্ বিষয়ে জাতিটি বড় হল ?”

সে উত্তর করল—“শৌর্য্যবীর্য্য জ্ঞান-গরিমা—সকল বিষয়েই। দেখুন না নেপোলীয়নের মত অজেয় বীরকে ত তারাই হারিয়ে দিয়েছিল। আবার প্রথম মহাযুদ্ধেও ত তাদের শৌর্য্যবীর্য্যেই জার্ম্মানী হেরে গিয়েছিল। এ-ত গেল তাদের শৌর্য্যবীর্য্যের কথা। এই শৌর্য্যবীর্য্যের সঙ্গে তীক্ষ্ণ কূটবুদ্ধি ও ধৈর্য্য না থাকলে কি এতবড় একটা পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্য দখলে রাখা যায় ?”

“তারপর আরও কি কি শোন ?”—আমি জিজ্ঞেস করলাম।

উত্তর হল—“যেদেশই এরা শাসন করে, সেদেশেরই বিপুল উন্নতি হয়, রাস্তাঘাট, ব্যবসাবানিজ্য, শিক্ষা স্বাস্থ্য প্রতিটি বিষয়ে।” ব'লে আমার দিকে চেয়ে একগাল হাসি হেসে জিজ্ঞেস করল—“বলুন, মিথ্যে কিছু বললাম কি না। ইংরেজ আমারও কেউ না, আপনারও কেউ না। তবে তাদের সম্বন্ধে বাবুদের মুখে যেমন শুনেছি, তেমনই বললাম।”

আমি উত্তর করলাম—“ইংরাজ এদেশের কেউ না হলেও আমার দেশের সে মনিব অর্থাৎ তার শাসনাধীনে আমরা আছি, যেমন তোমরা ছিলে তুর্কীদের শাসনাধীনে। তাই ইংরাজ

ভাল কি মন্দ, সে-সম্বন্ধে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে, কিন্তু তোমার বাবুদের সে অভিজ্ঞতা নেই। তোমার মত তারাও অন্যের মুখে বা প্রচার পুস্তিকায় যেমন শুনেছে বা যেমন পড়েছে, তেমনই তোমাদের বলেছে। যেমন, তুর্কী শাসন সম্বন্ধে আমাদের নিজেদের তেমন অভিজ্ঞতা নেই, যেমন তোমাদের আছে। তাই তুর্কীরা ভাল কি মন্দ—তা তোমরা যেমন জান, তেমন কি আমি জানি? ইংরাজদের সম্বন্ধে তুমি যে উচ্ছ্সিত প্রশংসা শুনেছ, তেমন প্রশংসা ত আমরাও তুর্কীদের সম্বন্ধে শুনেছি।" তুর্কীদের কথা বলতে গিয়ে বুঝলাম যে ঠিকমত জায়গায় আঘাত করেছি!

তুর্কীদের কথায় সে যেন সোজা হয়ে দাঁড়াল। হাসিমাখা তার মুখমণ্ডল গম্ভীর হল। সে আমায় জিজ্ঞেস করল—"তুর্কীদের সম্বন্ধে আপনারা কি শুনেছেন?"

"শুনেছি, তুর্কীরাই বল্কান অঞ্চলের অধিবাসীদের সভ্য করে তুলেছে। এতদঞ্চলের যা কিছু শিক্ষা শিল্প সভ্যতা উন্নতি—সকলই ঘটেছে তুর্কী শাসনের ফলে। তুর্কী শাসন মানেই কল্যাণকর শাসন। তা নইলে কি তুর্কীরা তোমাদের দেশকে শত শত বৎসর শাসন করতে পারত, ইউরোপের শক্তিবর্গও কি তাকে এতটা খাতির করত?"

"অবশ্য তুর্কীরা আমারও কেউ না, তোমাদেরও এখন আর কেউ না! তবে তুর্কীদের সম্বন্ধে আমি যেমন শুনেছি, তেমনই

বললাম।”—আমি উত্তর করলাম। এবার বুঝলাম, দাওয়াই যথাস্থানে পৌঁচেছে।

তুর্কীর নামে আর তুর্কী শাসনের প্রশংসায় তার ধৈর্য্যের বাঁধ যেন ভেঙ্গে গেল, সকল রাগ সকল দুঃখ তার মুখমণ্ডলে যেন কেন্দ্রীভূত হল। সে এবার চীৎকার করে বলে উঠল—“তুর্কীরা লুচ্চার জাত, তুর্কী শাসন মানে লুচ্চার শাসন। লুচ্চার শাসনে যা যা হওয়া সম্ভব, তুর্কীদের শাসনকালে এদেশে তাই ঘটেছিল। তুর্কী সুলতান বা খলিফার দল আর কিছু জানত বুঝত না, জানত বুঝত কেবল মদ আর মাগী, আর জানত ভাল—কি ক'রে দেশের লোককে শোষণ করে অনাহারে রেখে কুৎসিত বিলাসিতায় লক্ষ কোটি টাকা জলের মত খরচ করতে হয়। কর্ত্তব্যবোধ এবং লজ্জাবোধ এদের মস্তিষ্কের ত্রিসীমানায়ও ছিল না। এই পাষণ্ডের দল যদি আজকালও আমাদের এই সুন্দর দেশে শাসন করত, তবে এই দেশ যে আজ এক মহাশ্মশানে পরিণত হত, তাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।” বলতে বলতে আমার সঙ্গীদের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল—“এরা ত শিশু, তুর্কী শাসনের এরা কি আর জানে? কিন্তু আমি জানি, শুধু জানিই না, তুর্কী শাসনের তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভের দুর্ভাগ্য আমার হয়েছে। তা' আমার বয়স দেখেই বুঝতে পারেন।” আমি উত্তর করলাম—“তুর্কী শাসনের নামে যে কুৎসা বা কেচ্ছা তুমি আমাকে শোনালে, ইংরাজ শাসনের কথা বলতে হলে অবিকল

ঐরূপ কুৎসা আমিও গাইতে পারি। মনে রেখো—পরকে শাসন বা শোষণ করতে গিয়ে সব মনিবই হয় একরূপ, ইতর বিশেষ ঘটে শুধু তাদের বাহ্য আচরণে।"

আর আলাপ আলোচনার সুযোগ না দিয়ে আমার সঙ্গীরা আমাকে উঠতে বললে। আমিও উঠলাম। কৃষকটিকে আমার শুভেচ্ছা জানিয়ে এবার এক গ্রামের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলাম।

সাইকেলে চলতে দেখে পথঘাটের কুকুরগুলি ঘেউ ঘেউ করে আমাদের পেছন পেছন তাড়া করল। কিন্তু আমার সঙ্গীদের ছেড়ে কুকুরগুলির নজর পড়ল যেন আমারই উপর বেশী। মনে মনে ভাবলাম—"কুকুর, তুইও দেশী বিদেশী চিনিস্, আপন-পর তোরও জ্ঞান আছে?"

একটি বাজারের ভিতর ঢুকতেই ক্রেতা বিক্রেতা বাজারের সকল লোকই যেন একটা অদ্ভুত কিছু দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেল। সকলের কানাকানি শুরু হয়ে গেল। দশের ফিস্ ফিস্ শব্দে গুঞ্জন ধ্বনি উঠল। যেখানে দাঁড়াই, সেখানেই ছেলে ছোকরার ভীড় হয়। ভীড় ঠেলে অপর জায়গায় চলি, কিন্তু ছেলেরা আর আমাদের পেছন ছাড়ে না, কৌতূহলজনিত আগ্রহে তারা আমার প্রতিটি অঙ্গভঙ্গী লক্ষ্য করে চলল।

কিভাবে বাজার বসে, কি কি জিনিষ পাওয়া যায়, দরাদরি হয় কিনা—এসব দেখতে আমি বাজারে ঢুকেছিলাম। কিন্তু আমি আর কি দেখব, তারাই আমাকে দেখতে লাগল।

সকলেই যেন হাত গুটিয়ে বসে রইল। সুতরাং আমার বাজার দেখা ভাল হল না, তবে হ্যাঁ, দোকানগুলি সাজানো গোছানো কিনা, কি কি জিনিষ বাজারে উঠেছে, তা আমি মুহূর্ত্তেই দেখে নিয়েছিলাম।

আমার সঙ্গে লোকজনের কথা হল কম, কিন্তু আমার সঙ্গীদের সঙ্গে কথা হল অবিরাম। প্রশ্নের পর প্রশ্ন, যেন প্রশ্নের মিছিল। কি প্রশ্ন হল, আর প্রশ্নের কি উত্তরই বা আমার সঙ্গীরা দিল, কিছুই বুঝলাম না। বুঝলাম না—প্রশ্নের সঠিক উত্তর হল কতটা, আর কতটাই বা হল বানানো মিথ্যা। পরস্পরের ভাষা যেখানে পরস্পরের দুর্ব্বোধ্য, সেখানে ত কোন অসুবিধেই নেই ?

কিছুক্ষণ পর বাজার ছেড়ে পথে এলাম, কিন্তু পেছন পেছন লোকের ভীড় কমল না। আমাদের দেশে ত এরূপ হয়, কিন্তু ইউরোপের গ্রামে গ্রামেও যে এরূপ হয়, তা হয়ত অনেকেই জানে না।

কোথায় যাই, করি কি, ভাবতে ভাবতে শেষে চল্লাম একটি 'শিশু বিদ্যালয়' দেখতে। বিদ্যালয়ে প্রবেশমাত্র অনেকগুলি ছাত্রছাত্রী বেরিয়ে এল। মুখে চোখে তাদের বিরাট ঔৎসুক্য। কিন্তু একজন শিক্ষকের তাড়া খেতে মুহূর্ত্তে সুবোধ শিশু হয়ে তারা সব ঘরে ঢুকল, তবে পাঠে মন দিল কিনা বলতে পারি না।

স্কুল প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতেই একজন শিক্ষক এসে আমার করমর্দ্দন করে অভ্যর্থনা করলেন। বলা বাহুল্য অভ্যর্থনা করতে গিয়ে যে ভাষা তিনি ব্যবহার করলেন, তার সোজা অর্থ না বুঝলেও মর্ম্মার্থ গ্রহণ করতে পারলাম। মর্ম্মার্থ হল—"সুপ্রভাত, আপনাকে পেয়ে আমরা খুব খুসী হলাম।" অভ্যর্থনাসূচক কথাগুলির সঙ্গে অবশ্যই তাঁর মুখে চোখে হাসি আর খুসীর ভাব প্রকাশ পেল।

আমার সঙ্গীরা রাস্তায়ই দাঁড়িয়েছিল। স্কুলে প্রবেশ করেছিলাম মাত্র আমি একা। ভদ্রলোকের সঙ্গে ত চললাম। তিনি নিয়ে গেলেন শিক্ষক মহাশয়দের বিশ্রাম ঘরে। হঠাৎ একজন বিদেশীকে ঘরে ঢুকতে দেখে উপস্থিত সকলেই যেন বিস্মিত হল। সেই বিস্ময় তাঁদের চোখেমুখেও প্রকাশ পেল। মুহূর্ত্ত দেরী না ক'রে সকলেই মুখে হাসি নিয়ে একের পর এক এসে আমার করমর্দ্দন করলেন। তারপর ত বসলাম। কিন্তু ভাষা সমস্যায় আমরা সকলেই সমানভাবে বিব্রত হলাম। আমি ইংরাজী বলি ত তাঁরা বিন্দু বিসর্গ কিছুই বুঝেন না, আর তাঁরা বলেন ত আমিও কিছুই বুঝি না। ফলে হাস্যকর একটি পরিবেশ সৃষ্টি হল। অথচ আমার সম্বন্ধে তাঁদের কৌতূহলের অবধি নেই।

আমার সঙ্গে যে তাঁদের দেশের আরও কয়েকটি শিক্ষিত ছেলে আছে, আর তারা যে সকলেই ইংরাজী জানে, তা' আমি এতক্ষণ গোপন রেখেছিলাম, গোপন রেখেছিলাম এই জন্য যে

অজ্ঞাত কুলশীল একজন বিদেশীকে তাঁদের মধ্যে পেয়ে তাঁরা কিরূপ ব্যবহার করেন আর ভাষা সমস্যাই বা কিভাবে সমাধান করেন, তা দেখবার জন্য।

ভাষাসমস্যায় বিব্রত হয়ে, আর আমি কোথাকার লোক, এশিয়ার না আফ্রিকার, তা জানতে বা বুঝতে না পেরে তাঁরা আমাকে অবশেষে নিয়ে গেলেন স্কুলের লাইব্রেরীতে। তারপর এশিয়া এবং আফ্রিকার তুইখানি মানচিত্র এনে দেয়ালে টানানো হল। কোন্ দেশটিতে আমার বাস—তা মানচিত্রে দেখাতে তাঁরা এখন আমাকে ইসারায় অনুরোধ করলেন। বলাবাহুল্য তাঁদের অনুরোধ আমি রক্ষা করলাম। কিন্তু ভারতে আমার বাস অর্থাৎ আমি একজন ভারতবাসী জেনে তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ হলেন আশ্চর্য্য। আমার সম্বন্ধে ও আমার দেশ সম্বন্ধে তাঁদের কৌতূহল যেন এখন শতগুণ বৃদ্ধি পেল। প্রশ্নবাণে তাঁরা আমাকে জর্জ্জরিত করতে চাইলেন, কিন্তু মনের সেই বাসনা, সেই আগ্রহ ইসরায় ইঙ্গিতে আর তৃপ্ত হল না।

কিছুক্ষণ পরে ইসারায় তাঁদের অপেক্ষা করতে বলে আমি বাইরে এলাম। এসে আমার ইংরাজী জানা সঙ্গীদের সঙ্গে নিয়ে স্কুলঘরে প্রত্যাবর্ত্তন করলাম। তাদের পেয়ে শিক্ষকদের অবরুদ্ধ ভাবাবেগ প্রকাশ হল।

প্রাচীন শিক্ষা-সংস্কৃতি সভ্যতার আদিভূমি ভারত ছিল তাঁদের কল্পনার একটি দেশ। সেদেশেরই একজনকে দেখতে পেয়ে

ভারত সম্বন্ধে ভূগোল ইতিহাসের কাহিনীগুলি যেন তাঁদের মনে পড়ে গেল। কত বিভিন্ন রকমের প্রশ্ন আমাকে তাঁরা করে চললেন। প্রশ্ন শুনে আমার মনে তাঁদের সম্বন্ধে যে ধারণাই হয়ে থাকুক না কেন, তাঁরা যে ভারত সম্বন্ধে তাঁদের মনের শত কৌতূহল মেটাতে চেয়েছিলেন, তা বুঝলাম। তাই কোন প্রশ্নেরই যথাযথ উত্তর দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করলাম না।

যে ভারতের কোন লোককে তাঁরা জীবনে কখনও কোনদিন দেখেননি, সেই ভারতের একজনকে চোখের সামনে তাঁরা পেয়েছেন্—এটা যেন একটা বিস্ময়কর ব্যাপার। ইহাই তাঁদের সকল কথাবার্তায় আচরণে প্রকাশ পেল। উৎসাহের প্রাবল্যে আর এই সুযোগ নষ্ট হওয়া উচিত নয়, মনে করেই বোধ হয় শিক্ষকগণ আমাকে ক্লাশে ক্লাশে নিয়ে চললেন। এক এক ক্লাশে যাই, আর ক্লাশের শিক্ষক ছাত্রদের মানচিত্রে দেখিয়ে দেন —কোন্ দেশের আমি লোক, আর আমি যে ভূ-পর্য্যটক, সে-পরিচয় দিতেও তাঁরা ভুল করলেন না। পরিচয় শেষে প্রতি ক্লাশেই ছাত্রদের উদ্দেশ্য করে আমাকে কিছু কিছু বলতে হল।

ক্লাশে ক্লাশে ছাত্রদের মধ্যে আমার হস্তাক্ষর সংগ্রহ করবার একটা প্রবল আগ্রহ প্রকাশ পেল। ফলে অটোগ্রাফ বা হস্তাক্ষরের জন্য আমার সামনে টেবিলের উপরে খাতার পাহাড় সৃষ্টি হল। আর শুধু নাম লিখে দিলেই চলল না। দু-একটি উপদেশ বাণী বা শুভেচ্ছাসূচক বাণীও প্রতি খাতাতেই লিখে দিতে হল। কিন্তু লিখতে গিয়ে মুস্কিলে পড়লাম আমি

বেশী। এক রকমের কথা বা উপদেশ সকল খাতায় লেখা মোটেই ভাল দেখায় না। আর নূতন নূতন কত উপদেশই বা লেখা যায়? আবার শুধু নাম লিখে দিলেও ছাত্রের কৌতূহল সম্পূর্ণ তৃপ্ত হয় না। কিন্তু নূতন নূতন কথা ভাববার অবসরই বা কোথায়, আর অবসর থাকলেও মাথায় আসে না। তবুও আমার অসাধ্যের সাধন করতে প্রয়াস পেলাম।

ক্লাশগুলি দেখে, ছেলেমেয়েদের কিছু কিছু বলে ঐ বিশ্রাম ঘরে প্রত্যাবর্ত্তন করতেই চা পানে আমি আপ্যায়িত হলাম। কয়েকটি ফুলের মালাও জুটল।

একটি জিনিষ পূর্ব্বেও লক্ষ্য করেছি, এখানেও লক্ষ্য করলাম। তা' ছাত্রদের মাথা কামানো। ছাত্রদের মাথা কামানো দেখে আবার কেউ যেন মৃত আত্মীয়স্বজনের অশৌচ পালনের কথা না ভাবেন! একজন নয় দুজন নয়, বুলগেরিয়ার সকল ছাত্রের মাথা কামানো দেখে আমি প্রথমে আশ্চর্য্যই হয়েছিলাম এবং আমার কৌতূহলও বেশ হয়েছিল। স্বভাবতঃই জানতে আমি উদগ্রীব ছিলাম যে সকল ছাত্রের মস্তক মুণ্ডিত কেন। অন্যত্রও জিজ্ঞেস করেছিলাম, এখানেও আবার জিজ্ঞেস করে জানলাম যে ছাত্রদের মস্তক মুণ্ডিত করা হয় ছাত্রাবস্থা থেকে সকলকে শৃঙ্খলা জ্ঞান ভালভাবে শেখানোর জন্য। এক রকম পোষাক পরিধানের নির্দ্দেশও থাকে। সুতরাং মস্তক মুণ্ডন আর এক রকমের পোষাক পরিধান—বুলগেরিয়ার সকল ছাত্রকেই করতে হয়।

বিলাস-ব্যসনে জীবন যাপন করাই যে ইউরোপের লোকদের আদর্শ, সেই ইউরোপের একটি দেশের যুবক সম্প্রদায়কে সৌন্দর্য্যবোধ ছেড়ে ডিসিপ্লিন শিক্ষার নামে মস্তক মুণ্ডন ক'রে শিক্ষালাভ করতে হয়, ভাবলে সত্যই আশ্চর্য্য হতে হয়।

ডিসিপ্লিনের নামে এই মস্তক মুণ্ডনের নীতি একদল লোকের নিকট যতই বিরক্তিকর হোক না কেন, দেশের কোথাও কিন্তু এনিয়ে কোন হৈচৈ হয় নি, কোন প্রতিবাদ আন্দোলনও এ নিয়ে গড়ে ওঠেনি। এতে ইহাই বুঝায় যে ডিসিপ্লিনের নাম দিয়ে যে কোন বিরক্তিকর কাজও ঐ দেশের যুবকদের দ্বারা করানো যায়।

শিশু শ্রেণীর অনেকগুলি ছেলেমেয়ে এদিক দিয়ে ওদিক দিয়ে আমাদের ঘরখানায় চুপি মারছিল। প্রধান শিক্ষকমশাই এতে মাথা গরম না ক'রে, বরং ঠাণ্ডা মেজাজে স্নেহের স্বরে বাইরে গিয়ে ওদেরকে বুঝিয়ে দিলেন যে "উনি বিদেশী, অনেক দূর দেশ থেকে আমাদের দেশে বেড়াতে এসেছেন। যদি তোমরা খুব ভালভাবে থাক, ভালভাবে এখানে চলফির, তবে উনি দেশে গিয়ে নিশ্চয়ই তোমাদের খুব প্রশংসা করবেন। আমাদের দেশেরও তা'তে খুব সুনাম হবে। আর যদি তোমরা এমনভাবে উঁকিঝুঁকি মার, দুষ্টুমি কর, তবে ত উনি গিয়ে তোমাদের খুব নিন্দে করবেন। সেটা কি ভাল হবে?" "না মাষ্টারমশাই, না"—কয়েকজন একই সঙ্গে উত্তর করল।

"মাষ্টারমশাই, উনি কোন্ দেশের লোক, সেদেশের নাম কি, মাষ্টার মশাই ?"—একটি ছেলে উন্মুখ হয়ে জিজ্ঞেস করল। বলাবাহুল্য মাষ্টার মশাই উত্তর দিয়ে দিলেন। কিন্তু তা'তেই তিনি রেহাই পেলেন না। উত্তর শুনেই আবার আর এক প্রশ্ন হল। মাষ্টার মশাই শেষে বাধ্য হয়ে ওদেরকে বল্লেন—"যারা দুষ্টুমি করবে না, তারা ঘরের মধ্যে গিয়ে একধারে দাঁড়িয়ে থাকতে পার।" বলতেই মুহূর্ত্ত বিলম্ব না ক'রে চটপট অনেকগুলি ছেলেমেয়ে এসে ঘরটিতে ঢুকল। ঢুকে এক ধারে উৎসুক দৃষ্টি নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। খানিকক্ষণ বাদে একটি সুন্দর শিশু মাষ্টার মশাইয়ের কোলের কাছে এসে দাঁড়াল। তারপর চুপিচুপি তাঁকে কি বলতে মাষ্টার মশাই ফেললেন হেসে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—"কি বলছে ?" "বলছে, ওদের জন্য একটা হাতী আর একটা বড় সাপ যেন আপনি পাঠান।" শুনে সকলেই ফেলল হেসে। আমিও বিলম্ব না ক'রে ওকে কাছে এনে বললাম—"পাঠিয়ে দেব।" বড়ই সে খুসী হল। এইভাবে কিছুক্ষণ দেশ বিদেশের কথা নিয়ে আলাপ আলোচনায় সময় কাটিয়ে আমি স্কুল থেকে বিদায় নেবার জন্য উঠে দাঁড়ালাম।

আমার সঙ্গে সঙ্গে মাষ্টার মশাইরা ত এলেনই, বহু ছাত্রছাত্রীও এল। অবশ্য তারা কেউ স্কুলের সীমানা পার হল না। সকলকে প্রীতি সম্ভাষণ জানিয়ে আমি সাইকেলে উঠে পড়লাম, পেছনে পড়ে রইল সুখস্মৃতি জড়িত স্কুলটি।

যতক্ষণ দেখা গেল, ততক্ষণ আমি পেছন ফিরতেই ছাত্রছাত্রী আর মাষ্টার মশাইরা রুমাল উড়িয়ে তাঁদের হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ের শুভেচ্ছা আমায় জানাতে লাগলেন। ক্রমে উভয় পক্ষই পরস্পরের অদৃশ্য হয়ে গেলাম, কিন্তু আনন্দদায়ক মুহূর্ত্তগুলি আমার বার বার মনে পড়তে লাগল, মনে পড়তে চলার পথের মুহূর্ত্তগুলিকে বড়ই ক্লেশকর, বড়ই নিরানন্দ মনে হতে লাগল।

সঙ্গী ছাত্রবন্ধুগণ আমার সঙ্গেই রয়েছে, তবুও পরস্পরের মধ্যে একটা নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। নূতন ক'রে কোন প্রসঙ্গের অবতারণা ক'রে আলাপ আলোচনার সূত্রপাত করতে আমার মন মোটেই আগ্রহান্বিত ছিল না।

কিছুক্ষণ বাদে একজন সঙ্গী নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল। সে জিজ্ঞেস করল—"সকাল বেলাটা কাটল ভালই, না, কি বলুন?" সংক্ষেপে উত্তর করলাম—"হ্যাঁ, বেশ কাটল।" "বাচ্চা ছেলে মেয়েদের সঙ্গ বুঝি আপনার খুব ভাল লাগে?"—আবার প্রশ্ন হল। উত্তর করলাম—"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আনন্দভরা, হাসিমাখা শিশুদের মুখ দেখে কে না খুসী হয়?"

সঙ্গীরা আমার হোটেল পর্য্যন্ত এসে আমার নিকট বিদায় গ্রহণ করল। যাবার সময়ে বলে গেল—"আবার আপনাকে বিরক্ত করতে আসব।"

বিকেল হতে না হতেই তারা এসে আমার ঘরে উপস্থিত হল। তাদের ইচ্ছা যে সকাল বেলার মত আবার আমি কোথাও

ঐরূপ বেড়াতে যাই। আমারও যে খুব অনিচ্ছা ছিল, তা নয়। তাই তাদের প্রস্তাবে আমি আমার স্বীকৃতি জানালাম। আমার এই সম্মতির পেছনে একটি মাত্রই ইচ্ছা ছিল। তা' অল্প সময়ের মধ্যে দেশের যত বেশী যায়গা দেখা যায়, যত বেশী রকম লোকের সংস্পর্শে আসা যায়। কারণ একটা দেশ দেখতে গিয়ে যেন একটা দিকই শুধু না দেখি।

রাত্রি পোহালেই আমি সোফিয়া ছাড়ব, একথা ওদের প্রশ্নের উত্তরে জানাতেই ওরা দুঃখিত হল। তাই আরও দু একটা দিন থেকে যাওয়ার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানাল। অবশ্য আরও অনেক জায়গা থেকেও অনুরূপ অনুরোধ আমি পেয়েছিলাম। কিন্তু বিলম্ব করার অমার কোন উপায়ই ছিল না।

বৈকালিক চা পানের পর আমি রাস্তায় এসে সাইকেলে উঠলাম। আমার সঙ্গে সঙ্গে চলল আরও জন কয়েক। এবার অপর আর এক দিকে চললাম। রাস্তার অবস্থা যে তেমন ভাল নয়, তা বলাই বাহুল্য। যে দেশের রাজধানীতেই নেই পিঁচের রাস্তা, সেই দেশের অন্যত্র উহা থাকা নিশ্চয়ই সম্ভব নয়, আর নাইও। তাই খোয়া দেয়া রাস্তায় চলতে গিয়ে খুব আরাম বোধ হল না। কিন্তু আমার সঙ্গীরা এই রাস্তায় চলে আর বলে—"বেশ কিন্তু রাস্তা, পাকা রাস্তা!" আমাকেও তারা তাই বললে। তাদের মন্তব্যে আমি হেসে ফেললাম। হাসির কারণ জিজ্ঞেস করলে আমি বললাম—"হাসব না?, যে পথে

চলতে গিয়ে ঝাঁকনি খেয়ে খেয়ে পেটে খিল ধরে যায়, তা'ও ভাল রাস্তা? আর তার কথা বলতে গিয়েও আপনারা হন প্রশংসায় পঞ্চমুখ, যেন এই ধরণের রাস্তাঘাট আর কোথাও নেই।

"এমন ধরণের এত বড় রাস্তা আর কোথাও আছে নাকি?" —সর্ব্বাপেক্ষা কনিষ্ঠ সঙ্গীটি আমাকে জিজ্ঞেস করল।

কনিষ্ঠের প্রশ্ন শুনে আমার মনে পড়ে গেল ইরানের (পারস্য) রাজধানী তেহেরাণের কথা। তেহেরাণে পিঁচের রাস্তাও যেমন নেই, তেমন দালানকোঠাও বড় বড় নেই। অথচ এই তেহেরাণের কথায় ইরাণবাসীরা মনে করে—উহা যেন স্বর্গের ইন্দ্রপুরী। এত সুন্দর এত ভাল সহর যেন ত্রিভুবনেই আর নেই।

আরও একটি ঘটনার কথা আমার মনে পড়ে গেল। তা' আমার শৈশবের কথা। বিক্রমপুরের গ্রাম থেকে নারায়ণগঞ্জ সহরে পদার্পণ ক'রে যেদিন রাইফেল ছোঁড়া শিখবার জন্য তৈয়ারী উঁচু টিঁপিটি দেখলাম, সেদিন উহাকেই পাহাড় ভেবে পাহাড়ে চড়ার যে অপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করেছিলাম, তার মত আনন্দ পরবর্ত্তীকালে পাহাড় পর্ব্বতে শত শত মাইল চ'লে, আর হাজার হাজার ফিট উর্দ্ধে আরোহণ ক'রেও আমি পাইনি। তখন ঐ টিঁপিটি দেখে সত্যই আমার মনে হয়েছিল যে এত সুন্দর পাহাড় বোধ হয় খুব কমই আছে।

শৈশবের এই ঘটনার কথা মনে উদয় হতে না হতে প্যারীর প্রদর্শনীর কথাও একবার মনে পড়ে গেল। সপ্তাহের দুদিন এই প্রদর্শনীতে রঙ্গীন আলোয় বিভিন্ন রকমের ফোয়ারার জল উদ্গীরণে, আর সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র রংএর অসংখ্য বেলুন দূর আকাশে সার্চ্চলাইটের আলোয় এক অপূর্ব্ব দৃশ্য সৃষ্টি করত। এই সময়ে কিছু কিছু বিভিন্ন রকমের বাজিও ছোঁড়া হত। ইহা দেখে একদিন কয়েকজন ফরাসী শিক্ষিত ভদ্রলোকও বিস্ময়ে আবিষ্ট হয়েছিলেন। তাঁদের পাশে বসা আমাকে তাঁরা বললেন—"না, এমন আর অন্য কোথাও হয় না। পৃথিবীর আর কোত্থাও এরূপ হতে পারে না। সৌন্দর্য্যবোধ আর নব নব পরিকল্পনা—তা' আমাদের ছাড়া অন্য আর কারও মাথায় এমন আসে না।" কিন্তু তাঁরা জানতেন না যে দক্ষিণ ভারতে মহিশূরের অদূরে কৃষ্ণরাজা-সাগরের বাঁধ সংলগ্ন বাগানটিতে আলো এবং ফোয়ারার এক অপূর্ব্ব এবং মনোমুগ্ধকর দৃশ্য সৃষ্টি হয়, যার তুলনায় প্যারীর ঐ দৃশ্যও নিষ্প্রভ মনে হয়। আর এই পরিকল্পনাও যে সম্পূর্ণ নূতন, তা বোধ হয় নয়। কারণ কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বেই সাজাহানের তৈয়ারী বাগানগুলিতে, বিশেষতঃ কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরের উপকণ্ঠে বিখ্যাত শালিমার বাগে ফোয়ারার ঐরূপ একটা পরিকল্পনার আভাস দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু আমি যখন ফরাসী ভদ্রলোকদের নিকট ভারতের কৃষ্ণরাজাসাগরের ঐ বাগানের কথা বললাম, তখন বোধ হয় আত্মাভিমানে আঘাত

পেয়ে তাঁরা হলেন বিমর্ষ, বোধ হয় আমার প্রতি খানিকটা অসন্তুষ্টও হয়েছিলেন, যদিও আমরা ছিলাম পরস্পরের অপরিচিত।

কিন্তু আমাদের ভারতীয়দের মানসিক অবস্থা বোধ হয় অন্যরূপ, যার ফলে আমাদের নিজস্ব সকল কিছুকেই খারাপ মনে হয়, আর বিলাত আমেরিকার বা রুশিয়ার সকল কিছুই ভাল বলে বোধ হয়। বহুলোক আমাকে জিজ্ঞেস করেছে, "আচ্ছা, বিলাতে কি ডোবা নালা, খানাখন্দ আছে?" যেন ভগবানের অভিশাপে সকল ডোবানালা, খানাখন্দ আমাদের দেশেই তৈয়ারী হয়েছে। যেন বিলাতে ঐসব ডোবানালা নেই, খানাখন্দ নেই। সেখানকার রাস্তাঘাট সকলই যেন সোনার পাতে মোড়ানো, ঝকঝকে, তকতকে। সেদেশের লোকগুলি যেমন সুন্দর, তেমনই তাদের রাস্তাঘাট মাঠঘাট সকলই যেন সুন্দর!

গত যুদ্ধের সময়ে যখন লণ্ডন সহরের উপরে অবিরাম জার্ম্মানীর বোমাবর্ষণ চলছিল, তখন একদিন কলকাতার ট্রামে আমারই পাশের একজন ভদ্রলোক তার এক বন্ধুকে বলছিল—"এত বোমাতেও যে লণ্ডনের কিছুই হচ্ছে না, তার কারণ সহরটির বাড়ীঘর সবই underground-এ (মাটির নীচে)।" তার এই সংবাদটির সূত্র জানতে চাইলে, সে জন-কয়েক অজ্ঞাত বিলাত ফেরতের নাম ক'রে ফেলল, তারপর মন্তব্য করল—"আপনি কি জানেন?" আমি বেকুব ব'নে

গেলাম। সুতরাং কা'রও ভুল সংশোধন করতে যাওয়া বড়ই বিপজ্জনক। তা'ছাড়া বিদেশ বিভূঁয়ে সকলের সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষা ক'রে চলাই উচিত। এমন কিছু সেখানে বলা উচিত নয় যা'তে কা'রও আত্মাভিমানে প্রচণ্ড আঘাত পায়, বিশেষতঃ জাতীয় মনোভাবে আঘাত পেতে পারে—এমন কিছু ত বলাই উচিত নয়, সত্য হলেও নয়।

কনিষ্ঠের প্রশ্নোত্তরে আমি জানালাম যে, "পার্শ্ববর্ত্তী দেশ সমূহেও পিঁচ দেওয়া মসৃণ রাস্তাঘাট আছে। ইতালী, ফ্রান্স, জার্ম্মানী, বিলাত প্রভৃতি দেশের সঙ্গে ত রাস্তাঘাটের কোন তুলনাই হয় না।" তাদের দেশের রাস্তাঘাট থেকেও ভাল রাস্তা অন্যত্র আছে, জেনে মানসিক বিষণ্ণতা তাদের মুখের উপরে ছায়াপাত করল। তাদের এই বিষণ্ণতা দূর করবার জন্য আমি মন্তব্য করলাম—"পৃথিবীতে কোন দেশই সকল বিষয়ে সমান উন্নত হয় না। প্রতি দেশেরই কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যার জন্য প্রত্যেক দেশ গর্ব্ব বোধ করতে পারে।" আমার এই মন্তব্যে মেঘ ভারাক্রান্ত আকাশে হঠাৎ এক ঝলক রোদের মত প্রসন্নতায় তাদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। একজন আগ্রহভরে জিজ্ঞেস করল—"কোন্ বিষয়ে আমাদের বৈশিষ্ট্য আপনার চোখে পড়ল।" "আপনাদের বৈশিষ্ট্য আমার চোখে পড়ল আপনাদের আতিথেয়তায় ও আন্তরিকতায়। অবশ্য ইহা প্রাচ্য দেশসমূহেরই বৈশিষ্ট্য, ইউরোপের মাটিতে আপনাদের মারফৎ প্রকাশ পেয়েছে।" "কিন্তু বৈষয়িক বিষয়ে?"—

অন্য একজন প্রশ্ন করল। উত্তর করলাম—"বৈষয়িক বিষয়ে ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় আপনারা যে এখনও পিছিয়ে আছেন, তার জন্য দায়ী দেশের বহু শতাব্দীব্যাপী পরাধীনতা। পরশাসন এমন একটা জিনিষ যার ফলে দেশের বা দশের কোন উন্নতিই হতে পারে না, একমাত্র শাসকের ছাড়া।

যতই বেলা পড়ল, রাস্তায় ততই যানবাহনের সংখ্যা বাড়ল, অর্থাৎ সান্ধ্য ভ্রমণে ধনীর দল মোটরে বা ঘোড়ার গাড়ীতে বেরিয়েছে।

খানিকক্ষণ বাদে বড় রাস্তা ছেড়ে আমরা গ্রাম্য পথ ধরলাম। আমাদের দেশের গ্রামের মতই পথ। তুধারে কোথাও আঙ্গুরের বাগান পড়ল, কোথাও বা গমের ক্ষেত পড়ল। গ্রামের বাড়ীগুলি খুব বিক্ষিপ্ত নয়, একে অপরের কাছাকাছি। তবে বাড়ী সবই দালান।

একটি গ্রামে যখন পৌঁছলাম, তখন সন্ধ্যার আঁধার গ্রামখানির উপরে নেমে এসেছে, বাড়ী বাড়ী সন্ধ্যার আলো জ্বলে উঠেছে। তখনও গ্রামের বধূরা সকলে টিউবওয়েল এবং কূয়া থেকে জল নিয়ে বাড়ী পৌঁছেনি। পথে পথে এই বধূর দলের সাক্ষাৎ পেলাম।

কিশোর কিশোরীর দলও সন্ধ্যা সমাগমে রাস্তায় রাস্তায় হাসির হিল্লোড় উঠিয়ে, কেউ কেউ বা গান গেয়ে, গৃহাভিমুখে চলেছে।

গ্রামের এই পথে পথে যাদের সঙ্গেই দেখা হল, আমার মত, কোন্ আজব দেশের এক লোককে দেখে অনেকেই তারা হল হতচকিত। যতক্ষণ দেখা গেল, তারা ঘাড় ফিরিয়েও আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

চলতে চলতে এক যায়গায় অনেক লোকের সমাবেশ চোখে পড়ল। খানিক পরে আমরাও এসে এই সমাবেশের সংখ্যা বৃদ্ধি করলাম। পেছনের দিকে একজন বিদেশীকে দেখতে পেয়ে আমার সম্বন্ধে লোকজনের ঔৎসুক্য বৃদ্ধি পেল। আমার পরিচয় আর গোপন রইল না। সঙ্গে সঙ্গে সম্মুখের এক সারি আসনে গিয়ে আমার ও সঙ্গীদের বসবার স্থান হল।

ঐ সমাবেশের সম্মুখে একটি ফিল্ম দেখানো হচ্ছিল। একখানি যুদ্ধের ছবি। ছবিখানিতে প্রথম মহাযুদ্ধে প্রবল পরাক্রান্ত জার্ম্মান সৈন্য বাহিনীর বীরত্বের কাহিনীই বেশী প্রকাশ পেয়েছে। তা দেখে পরাজিত জার্ম্মানীর জন্য দুঃখ অপেক্ষাও শ্রদ্ধা হল বেশী, এমন কি বিজেতা ইংরাজ ফরাসী সৈন্যের গৌরবগাথাও যেন ম্লান হয়ে গেল।

ছবিখানা অবশ্য জার্ম্মানীর তোলা, এমনভাবে তোলা যে, বিগত প্রথম যুদ্ধের গ্লানিকর পরাজয়ের কাহিনী মনে হলেও নূতন উৎসাহ উদ্দীপনায় পিতৃভূমির সেবার জন্য আত্মচিন্তা বিসর্জ্জন দিয়ে যেন দেশের যুবক যুবতীর দল দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ হয়।

ছবিখানির একটি দৃশ্য আজও মনে পড়লে যুগপৎ আনন্দে ও দুঃখে আমি অভিভূত হয়ে পড়ি। ফরাসী রণক্ষেত্রে সামনা

সামনি দুটি ট্রেঞ্চে (আঁকা বাঁকা গভীর খাত, যার মধ্যে সৈন্যগণ সময় বিশেষে লুকিয়ে আড়াল থেকে বিস্ফোরক দ্রব্য শত্রুর প্রতি নিক্ষেপ ক'রে আত্মরক্ষা করে। এক কথায় টেঞ্চকে আত্মরক্ষার ঘাঁটি বলা যায়।) ফরাসী এবং জার্ম্মান সৈন্য। ট্রেঞ্চে শত্রুর গোলায় কিছু জার্ম্মান সৈন্য নিহত হয়, তাদের ক্যাপ্টেনও আহত হয়। মাটির নীচে একটি কক্ষে আহত ক্যাপ্টেন শায়িত রয়েছে, পাশে জ্বালানো মোমবাতি। সহচর সৈনিকগণের আপ্রাণ সেবাযত্নেও আর তার জীবন রক্ষা হল না, কিন্তু মৃত্যুকালে অস্ফুটস্বরে সে সঙ্গিগণকে বলল —"না, যুদ্ধ মোটেই ভাল নয়। কিন্তু পিতৃভূমির সম্মান রক্ষার্থে প্রাণত্যাগের মত শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য আর কি আছে ?"

যুদ্ধে পরাজিত হয়েও তাই জার্ম্মানগণ পরাজয়ের গ্লানি থেকে ছিল সম্পূর্ণ মুক্ত, মনে প্রাণে তারা নিজেদেরকে নির্দ্দোষ ভাবতে পেরেছিল। নচেৎ আরও বেশী ধ্বংসকর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্য জার্ম্মান জাতি প্রস্তুত হতে পারত না।

মহাযুদ্ধের ছবি তুলতে গিয়ে উভয়পক্ষই নিজ নিজ দেশের শৌর্য্যবীর্য্যের কাহিনীই বড় করে দেখায়, নিজেদেরকে সকল কলুষমুক্ত, নির্দ্দোষ প্রমাণ করার চেষ্টা করে, যেন দেশের যুবক যুবতীবৃন্দ এক মহান আদর্শের প্রেরণায় নূতন নূতন কর্ত্তব্যের আহ্বানে বিপুলভাবে সাড়া দেয়।

রাত্রি পোহাতে না পোহাতেই সোফিয়া থেকে রওনা হতে হবে। তাই জিনিষপত্রগুলি গোছগাছ ক'রে রেখে সকাল

সকাল শুয়ে পড়তে হবে, মনে হওয়ায় ফিল্ম শেষ হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কর্ত্তৃপক্ষের নিকট বিদায় গ্রহণ করে সঙ্গিগণসহ আমি স্থান ত্যাগ করলাম।

পথে বিশেষ গল্পগুজব না ক'রে সোজা সহরে চলে এলাম। আমরা হোটেলে যখন পৌঁছলাম, রাত তখন দশটা। কিন্তু রাত অধিক হলেও আমার দেশের সুনাম দুর্ণামের কথা ভেবে সঙ্গিগণকে চা পানে আপ্যায়িত করলাম। সঙ্গীদের বিদায় দিয়ে খাওয়া দাওয়া শেষ ক'রে যখন শয্যা গ্রহণ করলাম, রাত তখন সাড়ে এগারোটা, অর্থাৎ আর সাড়ে চার ঘণ্টা বা পাঁচ ঘণ্টা মাত্র আমি সোফিয়ার মায়ায় আবদ্ধ থাকব। তারপরই মুক্ত বিহঙ্গের স্বাধীনতাসুখ আমি ভোগ করব।

শেষ রাতে রওনা হয়ে পথ ভুলে আবার অন্য পথে চলে না যাই—এই ভয়ে পূর্ব্বদিনই ঘণ্টাখানেকের পথ আমি চলে দেখে এসেছিলাম।

হঠাৎ মোরগের ডাকে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। চারিদিকেই মোরগের ডাক। বুঝলাম, মোরগের প্রতিপালন হয় এখানে বেশী। ফর্সা হয়ে গেল, অথচ আমাদের পরিচিত কাকের কর্কশ কণ্ঠে ডাক আর শুনলাম না। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য মনে পড়ে গেল যে কাক ত শুধু বাংলা এবং আর দু-একটি প্রদেশেরই পাখী, অন্য কোথাও ইহার দর্শন পাওয়া যায় না। মোরগ কিন্তু তা নয়। ইহার কদর ভারতের হিন্দুদের নিকট

ছাড়া আর সর্ব্বত্রই সমান। রসনার তৃপ্তির জন্য পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে ইহার প্রতিপালন হয়।

গ্রীষ্মকালেও ইউরোপের দেশসমূহে সকাল বেলাটায় বেশ ঠাণ্ডা থাকে। গায়ে গরম কাপড়চোপর না দিয়ে চলাফেরা হয় কষ্টকর।

শিশিরসিক্ত গাছপালায় সূর্য্যের কিরণ পড়ায় চারিদিক চিক্‌মিক্‌ করে উঠেছে। সূর্য্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ঘাটে মাঠে চারিদিকে যেন নব জীবন এবং যৌবন প্রকাশমান হল। অভাব অনটন, আছে নাই, এমন শত প্রশ্ন এবং সমস্যা লোকের মনে আবার যেন নূতন ক'রে দেখা দিল।

রাত্রিটা কিন্তু ছিল বেশ, সকল সমস্যার জীবন্ত সমাধি। পরম এক শান্তি চারিদিকে পরিব্যাপ্ত ছিল। রাত্রির সেই আরাধ্য পরম শান্তি লাভ করতে আমাকে আরও ঘণ্টা বারো বা ততোধিক অপেক্ষা করতে হবে। আর ততক্ষণে আমি সাইকেলে শতেক মাইল বা তারও বেশী ঝাঁকনি খেয়ে খেয়ে দেহে পেটে ব্যথা বেদনা নিয়ে স্তারা-যাগোরায় পৌঁছে যাব।

স্তারা-যাগোরার নামে বিগত ঘটনাগুলি একের পর এক মনে পড়ে যেতে লাগল। মনে পড়ে পথের ক্লেশ গেলাম ভুলে। আরও অনেক সুখকর কল্পনা এসে আমার মাথায় স্থান পেল। তা থেকে আমি আমার প্রধান পাথেয় সংগ্রহ করলাম অর্থাৎ উৎসাহ উদ্দীপনা।

যেতে যেতে পথের পাশে একটি ভাল রেস্তরাঁ চোখে পড়ল। গ্রাম্য নিরালা পরিবেশ, অথচ তারই মধ্যে একটি সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রেস্তরাঁ। বিশ্রামের উপযুক্ত স্থানই বটে। সাইকেল থেকে নেমে এই রেস্তরাঁয় প্রবেশ করলাম। উদ্দেশ্য—ভাল ক'রে কিছু জলযোগ ক'রে চা পান করা। বেলা তখন আটটা, কিন্তু এরই মধ্যে আমি রাজধানী থেকে মাইল ত্রিশেক দূরে এসে পৌঁচেছি।

অন্যান্য যায়গার মত এখানেও আশেপাশের বহু লোক রেস্তরাঁর বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখতে লাগল। আমার হাঁটা-চলা-বসা-খাওয়া সকলই যেন তারা মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল। মনে মনে আমি বেশ অস্বস্তি বোধ করলাম, কিন্তু বলবার ত উপায় নেই। আর রেস্তরাঁয় পর্দ্দাও নেই যে তা' টেনে দিয়ে নিজেকে আড়াল করব।

খাওয়া শেষ করে বিলের পয়সা শোধ করে দিয়ে আবার সাইকেলে উঠে পড়লাম। যথাসাধ্য দ্রুত চলতে সুরু করলাম। কিন্তু আমার মনের ইচ্ছা আর চেষ্টা বাধাপ্রাপ্ত হল। চলেছি কিন্তু ইউরোপের একটি প্রধান রাস্তায়, যে-পথে জার্ম্মান সমর নায়কগণ প্রাচ্যদেশে অভিযান চালানোর জন্য বার বার কতবার পরিকল্পনা করেছিল। অর্থাৎ সোফিয়া হয়ে তুরস্কের অন্তর্গত ঐতিহাসিক কন্সটেণ্টিনোপলের পথ। কন্সটেণ্টিনোপল্ পুরানো নাম, বর্ত্তমানে ইস্তানবুল নামে প্রসিদ্ধ।

অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রসিদ্ধ পথ ইহা হলেও একটি বাজে রাস্তা। সাইকেলে চলতে বেশ কষ্ট হল। তদুপরি এসে জুটল প্রতিকূল প্রবল হাওয়া। সোনায় সোহাগা হল। মাঝে মাঝে মনে হল—হেঁটে চলাই ভাল। কিন্তু সাইকেল ঠেলে হেঁটে চলতে গিয়েও ভাল লাগল না, আর কতটা পথই বা ঐভাবে যাওয়া যায়? তাই কখনও হেঁটে আর কখনও বা সাইকেলে এগুতে লাগলাম। পরিশ্রান্ত দেহ নিয়ে চলতে চলতে যখনই বেশ খানিকটা ঢালু রাস্তা পেলাম, তখনই সাইকেলে অলস-ভাবে বসে থেকে যে আরামবোধ করতাম, সে-আরামের তুলনা পাই না। এমন আরাম ভোগ করতেই ত আর একবার পাশের দেশেতে বিপদে পড়েছিলাম, ব্যথা বেদনায় অচল হয়েছিলাম। তা মনে পড়তেই আবার সাবধান হলাম, যেন নিজের দোষে পথে ঘাটে আর কোন বিপদ না ঘটাই। তাই পাহাড় থেকে নীচে নামবার কালে ভাল ক'রে সাইকেলের ব্রেক্ একবার পরীক্ষা ক'রে নিলাম। আর পাহাড়ের রাস্তাগুলিতে যে ঘন ঘন মোড় থাকে, সেখানেও বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করলাম। ঐ স্থানগুলিতেই ত বিপদ ঘটে বেশী।

পথিপার্শ্বের প্রাকৃতিক শোভা খুব যে সুন্দর, তা নয়, অর্থাৎ চোখে লেগে পথচলার কষ্টকেও লাঘব করে দিতে পারে, এমন নয়।

মাঠেঘাটে ক্ষেতের কাজে অনেক যায়গায় নারী পুরুষ উভয়কেই চোখে পড়ল। এক মাঠের ধারে কিছুক্ষণ বিশ্রাম-সুখ উপভোগের সময়ে একটি বয়স্ক কৃষক হুকার নল টানতে

টানতে এসে আমার নিকট দাঁড়াল। দাঁড়িয়েই আমাকে কি প্রশ্ন করল আর সঙ্গে সঙ্গে হুকার নলটি দিল আমার নিকট এগিয়ে। নল টানতে পারলে যে মনের ভাব আদানপ্রদানে সুবিধা হত বেশী, আর ভাবও যে বেশ জমে উঠত, তা বুঝলাম। কিন্তু তামাক খাওয়ার অভ্যেস না থাকায় তার অনুরোধ আমাকে করতে হল প্রত্যাখ্যান। তারপরে তার ছোট্ট মেয়েটি তারই ইসারায় নিয়ে এল একটি রুটি আর একটি ফল। কিন্তু তার এই আতিথেয়তার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে উহাও গ্রহণ করতে আমি আমার অস্বীকৃতি জানালাম। কিন্তু তা'তেও সে দমবার পাত্র নয়। সে যেন আমাকে কোন কিছু না খাইয়ে আত্মতৃপ্তি বোধ করবে না, এমনই যেন মনে হল। কিছুক্ষণ ভেবে শেষে ইসারায় পানীয়ের কথা আমাকে জিজ্ঞেস করল। আমি ভাবলাম 'কফি', কিন্তু সে নিয়ে এল বিয়ার। ফলে ইহাও আমি গ্রহণ করতে পারলাম না। পর পর এইরূপ প্রত্যাখ্যান করতে হওয়ায় তার সঙ্গে সঙ্গে আমারও মনটা গেল খারাপ হয়ে। কিন্তু উপায়ই বা কি? সে দুঃখিত হল। তার দুঃখ তার মুখেও প্রকাশ পেল। অবশেষে তাকে আমিই জিজ্ঞেস করলাম 'কফি'র কথা। কফি নাম শুনে এবার তার মুখেও হাসি প্রকাশ পেল। মেয়েকে বলতেই সে দৌড়ে চলল কফি আনতে। কফি তার কাছে নেই, আনতে হবে দোকান থেকে। শুনে আমি তাকে কফি আনতে করলাম বারণ, কিন্তু সে তা শুনল না।

কিছুক্ষণ পর মেয়েটি কফি এনে আমার কাছে করল হাজির। কিন্তু ঠাণ্ডা কফি। তবুও কিছু না বলে উহাই পান করলাম। পান ক'রে আমি যতটা তৃপ্তি না পেলাম, তদপেক্ষা অনেক বেশী তৃপ্তি যেন কৃষকটি বোধ করল।

খাণিকক্ষণ বিশ্রাম করে কৃষকের আতিথেয়তা ভোগ ক'রে, অতিথেয়তা অপেক্ষাও প্রবল আতিথেয়তাবোধের পরিচয় পেয়ে আমি খুসী মনে তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলার পথ ধরলাম।

মধ্যাহ্নে এসে প্লভদিভ সহরে পৌঁছলাম। ইহাই বুলগেরিয়া দেশের দ্বিতীয় বড় সহর, লোকসংখ্যা এক লক্ষের মত। সোফিয়ার মত উহাও একটি ঐতিহাসিক সহর। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে ইহা পরিচিত ছিল। ঐতিহাসিকগণের নিকট ইহা 'ফিলিপ্পপোলিস' নামেই বেশী পরিচিত।

সোফিয়া ছেড়ে রওনা হবার সময়ে ভেবেছিলাম—আর কোথাও রাত্রি কাটাব না, আমার গন্তব্যস্থানে না পৌঁছে। কিন্তু প্লভদিভ সহরে এসে মনে মনে ভাবলাম—"দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সহর এটা, এখানে যদি আমার রাত্রিবাস না হয়, তবে লোকেই বা কি বলবে?" যেন লোকে কি বলবে না বলবে তা ভেবেই আমি আমার থাকবার স্থান, রাত্রিবাসের যায়গা নির্ণয় করব!

সহরটির নাম কিন্তু শুনেছিলাম প্রচুর। প্রথম পদার্পণেই আমি হলাম নিরাশ, তবুও একটা দিন এখানে থেকে যাওয়াই

স্থির করলাম। ভাবলাম—"জীবনে এদেশে আসার আর সুযোগ হবে, না হবে, এই সুযোগ অপব্যবহার করব না। এখানকার যা কিছু আছে, দেখে যাব।"

থেকে যাওয়াই স্থির করলাম, কিন্তু আমার পকেট ত হাল্কা! তাই হোটেলে থেকে আর অতিরিক্ত পয়সা খরচ না ক'রে, সোজা গেলাম রেল-স্টেশনে। সেখানে বিশ্রাম ঘরে হাতমুখ ধু'য়ে জামাকাপড় ছেড়ে স্যুটকেশটি জমা রেখে আমি সহরের একটি রেস্তরাঁয় ঢুকলাম। খেলাম মুরগীর সুপ, শাকসব্জী, মাংস, তিন চার টুকরা রুটি আর পোয়া দেড়েক আঙ্গুর। মূল্য বাবদ আমাকে দিতে হল মাত্র আট আনার মত। বেশ সস্তা নয় কি?

প্লভদিভ খুব বড় সহর নয়। রাস্তাঘাটে পাথর দেওয়া, খোয়া দেওয়া। বাড়ীঘরগুলিও কিছু কিছু সেকেলে ধরণের, আর কিছু কিছু নূতন ধরণের। ১৯১৮ সনে এক ভূমিকম্পে সহরের যে সকল বাড়ীঘর ধ্বংস হয়ে যায়, তৎস্থলে নূতন নূতন বাড়ীঘর তৈয়ারী হয়েছে। তা'হলেও সহরটির রাস্তাঘাট বা বাড়ীঘর দেখে আমি মোটেই খুসী হলাম না। তবে দেশের মধ্যে সহরটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসাকেন্দ্র, আন্তর্জ্জাতিক রেল-পথেরও একটি বড় রেলজংসন।

ছোট্ট ছোট্ট কয়েকটি পাহাড় থাকায় সহরটির দৃশ্য দূর থেকে দেখতে নেহাৎ মন্দ নয়।

সহরটিতে গোটাকয়েক যাদুঘর আছে, যেখানে গেলে এতদঞ্চলের অনেক কিছু পুরানো জিনিষ দেখা যায়, অনেক কিছু তথ্য আহরণ করা যায়। অবশ্য ঐগুলি আন্তর্জ্জাতিক গুরুত্ব-সম্পন্ন না হওয়ায় আমার মত একজন বিদেশীর তা দেখতে তেমন আগ্রহ হল না।

বৈকালে সহরের রাস্তায় সাইকেলে চলবার কালে হঠাৎ একজন পেছন থেকে এসে আমার সাইকেল থামিয়ে দিল। আমি পেছন ফিরতেই একজন মধ্যবয়স্ক লোক হেসে ফেলল, তারপর হাত এগিয়ে দিল করমর্দ্দনের জন্য। ভালভাবেই করমর্দ্দন হল, কিন্তু আমার চোখেমুখে বিস্ময়ের ছাপ সম্পূর্ণ দূর হতে না হতেই সে ভাঙ্গাভাঙ্গা ইংরাজীতে বলল, "চিনলেন না?" আমি আরও বিস্মিত হলাম, আরও চিন্তায় পড়লাম, ভাবলাম—"তবে ত নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও আমাদের পরিচয় হয়েছে, আলাপ হয়ে থাক আর না-ই থাক।" কিন্তু সমুদ্র মন্থনের মত সারা স্মৃতিপট তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজেও আগন্তুকের সঠিক পরিচয় বের করতে পারলাম না। কিন্তু তাকে আমি চিনি না বা জানি না, সোজাসোজি একথা বললে পাছে সে অন্যরূপ কিছু ভাবে—এই ভয়ে আমি তার প্রশ্নের উত্তরে বললাম—"হ্যাঁ, আপনাকে আমি চিনেছি। তারপর কেমন আছেন, এখানে কোথায় উঠেছেন?" কিন্তু আমি যে তাঁকে ভালভাবে চিনিনি—তা' ভদ্রলোক বুঝতে পেরে বললেন—"না, আপনি আমাকে ভাল ক'রে চেনেননি।

আমার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল সোফিয়াতে সেই ভাস্কর-শিল্পীর বাসায়।” এখন আর পরিচয় দিতে হবে না, ব'লে আমি তাকে বললাম, “মনে কিছু করবেন না কিন্তু। আমার একটু ভুল হয়ে গিয়েছিল।” “না, না, মনে করার কি আছে,” বলে সে আমাকে নিয়ে একটি রেস্তরাঁয় প্রবেশ করল।

কফি পান করা কালে ভদ্রলোকের বন্ধুবান্ধব জন কয়েক এসে উপস্থিত হল। সকলেই তারা শিক্ষিত। কিন্তু অধিকাংশের মত এরাও ছিল ইংরাজীতে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, আর রেস্তরাঁয় বসে যার আতিথেয়তা আমি ভোগ করলাম, সেও ইংরাজী জানত না কিছুই, দু-চারটি ইংরাজী শব্দ ছাড়া। সুতরাং আমার সঙ্গে আলাপ আলোচনার জন্য তাদের বিরাট ঔৎসুক্য জাগলেও নির্ব্বাক থেকে শুধু চোখমুখের হাসির বিনিময় ছাড়া আর কোনও ভাবে মনের অভিব্যক্তি প্রকাশের সুযোগ হল না।

রেস্তরাঁ ছেড়ে বাইরে এলে ঐ ভদ্রলোকরাও আমার সঙ্গ নিল। পথে পথে চলি, আর সঙ্গিগণ আমাকে এ দালান ঐ দালান দেখিয়ে বিগত কাহিনীর ঐতিহাসিক গুরুত্ব স্মরণ করিয়ে দিতে চেষ্টা করল। কিন্তু বৃথাই হল তাদের শ্রম।

জার্ম্মান স্কুল, ফ্রেঞ্চ স্কুল, ধর্ম্মশিক্ষাবিষয়ক স্কুল—এইরূপ অনেকগুলি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাড়ী দেখে দেশের একটি প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র বলেও এই সহরের বিশেষ গুরুত্ব উপলব্ধি করলাম।

অনেকগুলি পুরানো গীর্জ্জাও ইহার ঐতিহাসিক গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছে। সহরের অলিগুলি ঘুরেও দেখলাম। তুর্কী প্রভাবে প্রভাবান্বিত কুসংস্কারে জর্জ্জরিত বহু মুসলমানেরও সাক্ষাৎ পেলাম। এদের দেহে মনে যুগোপযোগী কোন পরিবর্ত্তন চোখে পড়ল না। বোরখা পরা বহু মুসলমান নারীরও সন্ধান পেলাম। যাদের নামে এরা এখনও গৌরব বোধ করে অর্থাৎ যে তুর্কীদের সঙ্গে এদের অনেকের রক্তমাংসের সংস্রব রয়েছে বলে গর্ব্ববোধ করে, সেই তুরস্কের সমাজে যে বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন হয়েছে, তা' কিন্তু এরা মোটেই গ্রহণ করেনি।

সহরটিকে প্রদক্ষিণ করে চারিদিককার দৃশ্যবলী দেখে আমি যখন সঙ্গিগণের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রেলষ্টেশনে প্রত্যাবর্ত্তন করলাম, রাত তখন দশটা। সারাদিনের পথ চলায় শ্রান্ত দেহ, ঘুমে চোখের পাতা অবসন্নপ্রায়। আর দেরী না করে ষ্টেশন মাষ্টারের অনুমতি নেওয়া বাহুল্য হলেও তা' নিয়ে আমি বিশ্রাম ঘরে বিছানা পেতে শুয়ে পড়লাম। হোটেল খরচ না ক'রেই দিলাম একটি রাত কাটিয়ে। দেড় টাকা দু টাকা আমার বেঁচে গেল!

ষ্টেশনে থাকতে গিয়ে টাকা কিছুটা বেঁচে গেল বটে, তবে ঘুম আমার হল না বিশেষ। কারণ ট্রেণের পর ট্রেণ আসল, সঙ্গে সঙ্গে দলবদ্ধভাবে এক এক দল যাত্রী এই বিশ্রামাগারে ঢুকল। ঢুকেই কম্বলে ঢাকা অদ্ভুত চেহারার একজনকে দেখতে পেয়ে বহু যাত্রীই হল আশ্চর্য্য। কেউ কেউ কিছু জিজ্ঞেসও

করল, কিন্তু কোন প্রশ্নেরই উত্তর না দিয়ে আমি যেমন ছিলাম, তেমনই রইলাম। মনে মনে ঔৎসুক্য জাগলেও আমি একবারটিও চেয়ে দেখলাম না—আমাকে দেখে কা'র মুখ কিরূপ হল।

একটি ট্রেণ চলে যায়, আর আমি ভাবি—এবার বেশ ঘুমানো যাবে। ভেবে নিদ্রাদেবীর আবাহণ করি। কিন্তু ঘুম যখন সত্যই চোখের পাতায় ভর করল, অমনি আবার আর একটি ট্রেণের শব্দ হল; ক্রমেই তা নিকটতর হয়ে অবশেষে যেন আমার কানের পাশেই এসে থামল। আবার যাত্রীদের ওঠা নামা হল। কত যাত্রী আমার ঘরে এসে আবার হতচকিত হল।

কিছুক্ষণ বাদে বাদেই ট্রেণ এল। এইভাবে বারোটা বাজল, আর একটি দিনের শুভ আগমন হল।

রাত্রি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ট্রেণের আসা যাওয়া ক্রমেই কমে এল, কমে এলেও একেবারে বন্ধ হল না। যাত্রীবাহী ট্রেণ কমল ত মালবাহী ট্রেণের যাতায়াত সুরু হল। অর্থাৎ সারাটি রাত একপ্রকার জেগেই আমাকে কাটাতে হল। তাই বলে আমার কোন দুঃখ হল না। আর হবেই বা কেন? পকেটে যার পয়সা নেই, আরাম বিরাম তার হবে কি ক'রে?

অতি প্রত্যুষে ষ্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম, চললাম স্তারা-যাগোরায়। মাইল সত্তর আশির মত পথ। দেশের প্রধান

পথেই যখন চলতে গিয়ে ঝাঁকনি খেয়ে খেয়ে দেহে পেটে ব্যথাবেদনা হয়, তখন নিভৃত গ্রামাঞ্চলের রাস্তা যে কতটা ভাল, তা' অনুমান করা মোটেই অসম্ভব নয়।

মধ্যাহ্নের খররৌদ্রে চলতে চলতে একটি রাস্তার মোড়ে একটি ছোট রেস্তরাঁ পেলাম। আহারের উদ্দেশ্যে এই রেস্তরাঁতেই ঢুকলাম। মুরগীর স্যুপ, রুটি আর কিছু ফল—ইহাতেই আমার ক্ষুধা নিবৃত্ত আর রসনা তৃপ্ত করলাম।

আহারের পর বিশ্রামের বিশেষ প্রয়োজন বোধ করলাম। কিন্তু রেস্তরাঁতে যে বিশ্রামের বিশেষ সুযোগ হবে না, বসে থাকা ছাড়া, তা' বুঝলাম। তাই আবার পথে বেরুলাম একটি আরামপ্রদ বিশ্রামস্থল খুঁজে বের করবার জন্য। গন্তব্য পথে একটু এগুতে না এগুতেই কতকগুলি বৃক্ষের নীচে একটি ছায়া-সমন্বিত যায়গা চোখে পড়ল। যায়গাটি বেশ ঘন ছায়ায় আবৃত। আমার বিশ্রামের ইহাই আদর্শস্থল ভেবে এখানেই আমার ছোট্ট বিছানাটি বিছিয়ে নিলাম। এমনি ছায়াসমন্বিত ঘন আম্র বৃক্ষের ছায়ায় আমি আমার কৈশোরে চৈত্র বৈশাখের কত তপ্ত মধ্যাহ্নই না কাটিয়েছি। সেই সব সুখস্মৃতি একে একে এখন আমার মনে পড়ায় আমি আবার বিপুল আনন্দবোধ করলাম। (ইউরোপের আবহাওয়ায় আমগাছ হয় না। আমগাছ বোধহয় শুধু ভারতেরই গাছ। চীন, জাপান, ইন্দোনেশিয়া বা আরব, তুরস্ক প্রভৃতি কোন দেশেই আমগাছ হয় না)।

চারিদিকে টু শব্দটি পর্য্যন্ত নেই, একেবারেই নির্জ্জন। তা'ছাড়া রাত্রিতে ঘুম হয়নি মোটেই, কিন্তু পথ চলার পরিশ্রম হয়েছে খুব। সুতরাং অনুকূল পরিবেশ পেয়ে যেমন শুলাম, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমে আমি অচৈতন্য হলাম। ঘুম যখন ভাঙ্গল, সূর্য্য তখন পশ্চিম আকাশের শেষ প্রান্তে, বেলা প্রায় পাঁচটা।

হুড়মুড় ক'রে উঠে, বিছানাটি চোখের নিমেষে সাইকেলের পেছনে বেঁধে চটপট রওনা হয়ে পড়লাম। প্রায় আধ ঘণ্টা চলে একটি রেস্তরাঁ পেলাম। সেখানে মিনিট কয়েকের জন্য চা পান করে খানিকটা সতেজ হয়ে আবার চলতে সুরু করলাম। এখন আর সময় নেই, মনমেজাজও তেমন নয় যে চারিদিককার লোকজনের সঙ্গে আলাপে ইসারায় হাস্য পরিহাসের বিনিময় ক'রে আনন্দ অনুভব করব। এখন পথ চলার একটিমাত্র চিন্তাই আমাকে পেয়ে বসেছে, যে ক'রেই হোক স্তারা-যাগোরায় সাতটা আটটার মধ্যে পৌঁছতেই হবে। তাই শরীরের সমগ্র শক্তি দিয়ে দ্রুত চলতে চেষ্টা করলাম।

অন্ধকার রাত। পাহাড় না থাকলেও চলতে খানিকটা অসুবিধা হল। মাঝে মাঝে রাস্তার মোড় পেলাম। এই মোড়ে এসেই যত গণ্ডগোলের সৃষ্টি হল। কোন্ পথে যেয়ে কোথায় আবার পৌঁছব! একজনকে জিজ্ঞেস করেই আমি তুষ্ট থাকলাম না। যদি সে ভুল পথ দেখিয়ে থাকে। পর পর কয়েকজনের নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করে সেই পথে চলতে সুরু

করলাম। রাতের অন্ধকারে কোথায় যাই, কোনও কিছু জিজ্ঞেস করবার প্রয়োজন হলেই বা কা'কে জিজ্ঞেস করব, বিশেষতঃ পরস্পরের ভাষা যেখানে দুর্ব্বোধ্য? সুতরাং মনে মনে বহু রকমেব দুশ্চিন্তা উপস্থিত হল।

সকল দুশ্চিন্তার আশ্চর্য্যজনক সমাধান হয়ে গেল। একজন সাইকেল আরোহী পেছন থেকে এসে সঙ্গে সঙ্গে কিছুদূর যেয়ে আমাকে ইসারায় ইঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল—আমি কোথায় যাব। স্তারা-যাগোরার নাম করতেই সেও তাড়াতাড়ি জানাল যে সেও আমার সঙ্গী অর্থাৎ স্তারা-যাগোরায় সেও যাবে, সেখানকারই সে লোক।

সঙ্গী পেলাম। দুশ্চিন্তার বোঝা মাথা থেকে নেমে যেতে কতটা যে আরাম আর নিশ্চিন্তবোধ করলাম, তা' আজ আর ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। বিপদে ভগবানের হাত-ধরে সাহায্য করার মতই ইহা যেন মনে হল।

রাত দশটা। গন্তব্যস্থলে এসে পৌঁছলাম। সারাদিনের পথ চলা শেষ হল, দেহও অবসন্ন। একটি বড় হোটেলে এসে উঠলাম। হোটেলটির নাম "ইম্পিরিয়াল হোটেল"। হোটেলের দ্বিতলে একখানি সাজানো গোছানো ঘর ভাড়া নিলাম। ভাড়া বেশ সস্তাই বোধ হল, দৈনিক মাত্র পঁচিশ লেভা, আমাদের বারো আনার মত।

পরদিন প্রাতরাশ সেরে মিসেস উজুনভার বাড়ী গেলাম। বাড়ীখানা সহরের বৃহত্তম বাড়ী। বলাবাহুল্য বাড়ীতে

পৌঁছতেই মেয়ে এবং মা আমাকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানাল। মিঃ উজুনভার সঙ্গেও আমার পরিচয় হল। তিনি ছিলেন সহরের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক। পত্নী এবং মেয়ের তুলনায় তাঁকে ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ বলেই বোধ হল, যদিও আমার সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট হৃদ্যতা সৃষ্টি হয়েছিল। হয়ত বা বয়সের বিরাট পার্থক্যহেতুও তাঁর চারিত্রিক পরিবর্ত্তন কিছুটা হয়েছিল।

মেয়ে এবং মার ব্যবহারে সত্যই আমি মুগ্ধ হলাম। আমাকে খুসী করার জন্য কতই না তাঁদের আন্তরিক চেষ্টা। এই বাড়ীতে মিস্ উজুনভা তার গৃহশিক্ষক মিঃ টিলচেভের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেয়। এই ভদ্রলোক ইংরাজী বলতে পারতেন বেশ ভাল। শুনে আমি সত্যই আশ্চর্য্য হলাম যে তিনি ইংরাজী শিখেছেন কা'রও সাহার্য্য ছাড়াই, এমন কি কোনও ইংরাজী বইও না প'ড়ে, ইংরাজী শিখেছেন গ্রামোফোন রেকর্ডে ইংরাজী সংলাপ শুনে।

মিঃ টিলচেভ একজন কর্ম্মব্যস্ত যুবক। তাহলেও তাঁকে বেশ ধীর স্থীর সংযত বলে মনে হল। চলাফেরায়, আলাপ আলোচনায় তিনি আমাকে সাহায্য করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। বলাবাহুল্য, তাঁর এই সহৃদয়তার জন্য তাঁকে আমি ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর প্রস্তাব আমি গ্রহণ করলাম।

সন্ধ্যায় আমি বেড়াতে গেলাম স্টেশনের ধারে একটি বাগানে। বাগান অর্থে ফুলের বাগান বুঝলে ভুল করা হবে।

বাগানটিতে ছিল বড় বড় কতকগুলি গাছ, আর গাছের নীচে নীচে বসবার বেঞ্চ। বাগানটি বেশ নির্জ্জন নিস্তব্ধ।

বাগানের নির্জ্জনতা ভোগ করা আমার কপালে জুটল না। একটি বেঞ্চে বসতে না বসতেই যে-ক'য়টি ছেলে ছোকরা বাগানটিতে ছিল, তারা দৌড়ে এসে আমার সামনে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যেই আলোচনা সুরু করে দিল। জনকয়েক বয়স্ক এবং বৃদ্ধও এসে জনতার সংখ্যা বৃদ্ধি করল।

আমি উঠে বাগানের আর এক নির্জ্জন যায়গায় গিয়ে বসলাম। কিন্তু যায়গাটি আর নির্জ্জন রইল না, অল্পক্ষণেই একটি জনতার ভীড় হল। জনতার মধ্য হতে কেউ কেউ বা কিছু জিজ্ঞেসও করল।

কিছুক্ষণ পর এক ভদ্রলোক ভীড় ঠেলে আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। তারপর ভাঙ্গা ভাঙ্গা ভুলশুদ্ধ ইংরাজীতে আমাকে বললেন—"এখানে বড্ড লোকের ভীড়। চলুন আমার সঙ্গে, আর একটি নির্জ্জন এবং সুন্দর বাগানে যাই। সেখানে আর ছেলে ছোকরার ভীড় হবে না, কোন জনতা আর আপনাকে উত্ত্যক্ত করবে না। আমি মিউনিসিপ্যাল বাগানগুলির সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট। বাগানের সৌন্দর্য্য কিভাবে বৃদ্ধি করতে হয়, কিভাবে কোন্ গাছ কোথায় রুইতে হয়—এসবের নির্দ্দেশ আমিই দিই। আমি গার্ডেনিং সম্বন্ধে ফরাসী দেশে বিশেষ শিক্ষালাভ করেছি।"

ভদ্রলোকের নাম আশেন স্লবেভ। ঐ প্রস্তাবে আমি স্বীকৃত হয়ে জনতার হাত থেকে মুক্তিলাভ জনিত আনন্দে তাঁর সঙ্গে চললাম। কিন্তু যাবার পূর্ব্বে উপস্থিত জনতার বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তাদের কৌতূহল মেটানোরও চেষ্টা করলাম। কিন্তু অত সহজেই কি আর কৌতূহল মেটে? তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে আমার আধঘণ্টা চলে গেল। আমাদের মধ্যে দোভাষীর কাজ করলেন ঐ ভদ্রলোক।

ভদ্রলোক আমাকে বললেন—"চলুন, আর দেরী করবেন না। যতক্ষণ থাকবেন, ততক্ষণই প্রশ্ন হবে। প্রশ্ন হলে উত্তরও দিতে হবে। এদের কৌতূহলের আর শেষ নেই।" কিন্তু বিদেশে কি আমার কম জ্বালা! হাঁটা চলা বসা খাওয়া— সকল সময়ে কেবল একটি চিন্তাই আমার মন অধিকার ক'রে থাকে, যেন আমার ব্যবহারে কথাবার্ত্তায় চালচলনে আমার দেশের সুনাম বৃদ্ধি ছাড়া যেন বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ না হয়।

আমাদের দেশের মত এদেশেও বিদেশী ডিগ্রি ও ডিপ্লোমার মোহ আছে। বিদেশী ডিগ্রি যার আছে, সমাজে তার মান সম্মান পদমর্য্যাদাই বেশী, আর দেশী ডিগ্রিধারী ভিখও পায় না। এঅবস্থা যে শুধু বুলগেরিয়াতেই তা নয়, অন্যান্য দেশেও কমবেশী লক্ষ্য করেছি।

মিঃ স্লবেভের সঙ্গে আর একটি বাগানে এলাম। চারিদিক নির্জ্জন নিস্তব্ধ। বেশ ভালই লাগল। বাগানটি যে খুব

সুন্দর, তা কিন্তু নয়, তবে নানা জাতীয় ফুলে ভরা গাছে বাগানটির শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল।

বাগানটিতে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম, আর আমার সঙ্গী ভদ্রলোক ফুলগাছ সম্বন্ধীয় নানা তথ্য আমাকে জানাতে লাগলেন, যেন আমাকেও তিনি একজন বাগান-বিশেষজ্ঞ করে তুলবেন। বাগান-বিশেষজ্ঞ ভবিষ্যতে হই আর না-ই হই, তাঁর বক্তব্য শুনতে আমার ভালই লাগল।

এক-এক রকমের ফুল তিনি আমাকে দেখান, আর দু-একটি করে ফুলের ডোগা ভেঙ্গে হাতে রাখেন। এইভাবে সারা বাগানটিতে ঘুরতে গিয়ে বিচিত্র বর্ণের সুন্দর সুন্দর ফুলের একটি লোভনীয় তোড়া তৈয়ারী হল। আর তা' যখন মিঃ স্নুবেভ আমাকে আন্তরিকতার সহিত উপহার দিলেন, তখন সত্যই আমি খুব খুসী হলাম। অবশ্য ফুলের বর্ণ আর বাহারে কে না খুসী হয়?

এই বাগানে চলতে চলতে মিঃ স্নুবেভ আর একটি বাগানের খুব সুখ্যাতি করলেন। বাগানটি সহর থেকে মাইলখানেক দূরে একটি পাহাড়ে অবস্থিত। সুন্দর বাগান আর পাহাড়ের নাম শুনতেই মনে মনে আমারও তা' দেখবার আগ্রহ হল। তাই পরদিন সকালে ঐ বাগান দেখতে যখন ভদ্রলোক আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন, তখন সেই আমন্ত্রণ আমি খুসী মনেই গ্রহণ করলাম। স্থির হল যে তিনি আমাকে নেবার জন্য খুব সকালেই আমার হোটেলে আসবেন।

বাগান দেখতে দেখতে মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষকে মনে মনে ধন্যবাদ না দিয়ে পারলাম না। ছোট্ট সহর, ততোধিক ছোট্ট তার মিউনিসিপ্যালিটি, আয়ও খুব বেশী নয়। তা' সত্ত্বেও সহরের মধ্যে বা বাইরে সুন্দর সুন্দর বাগান তৈয়ারী করে সহর কর্ত্তৃপক্ষের চারিদিকে একটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আবহাওয়া সৃষ্টির ঐকান্তিক প্রয়াস চোখে পড়ল। কোন্ বাগান কত সুন্দর অসুন্দর, সেটা আমার কাছে বড় কথা নয়, বড় কথা ঐকান্তিকতা, যা ওখানে আমার চোখে পড়ল।

ঐ বাগানটিতে আর উৎসুক জনতার ঝামেলা আমাকে পোহাতে হল না। বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে সঙ্গীর সঙ্গে গল্প গুজবে ফুলের মাতোয়ারা গন্ধে সন্ধ্যাটা কাটিয়ে দিলাম। রাত যখন প্রায় দশটা, তখন আমরা পরস্পরের বিদায় নিলাম।

সকালে আমার ঘুম ভাঙ্গতে না ভাঙ্গতেই বন্ধুবর আমার হোটেলে এসে হাজির। বিছানায় শুয়ে আরও খানিকটা আরামভোগের ইচ্ছা মনে মনে পোষণ করলেও ফলবতী হল না। কারণ দেরী দেখে ভদ্রলোক নিজেই এসে আমার ঘরে ঢুকলেন। এখন না উঠে আর যাই কোথায়? ত্রস্তব্যস্ত হয়ে বিছানা ছেড়ে ভদ্রলোককে আমার নমস্কার জানিয়ে প্রাতঃকালীন কর্ত্তব্য কর্ম্মে আমি মনোযোগ দিলাম।

আধ ঘণ্টার মধ্যে জামাকাপড় পরে প্রস্তুত হয়ে ভদ্রলোকের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম, কথা হল—পথের কোন রেস্তরাঁয় প্রাত-রাস সেরে নেব।

সহর ছাড়লে আর রেস্তরাঁ পাওয়া যাবে না, মনে ক'রে সহরের একটি রেস্তরাঁয় ঢুকলাম। সেখানে কিছু জলযোগ আর চা পান করে এবার আমরা চল্লাম পাহাড়ে অবস্থিত বাগানটিতে। বাগান অপেক্ষাও পাহাড়ের নামে আমি আকৃষ্ট হলাম বেশী। অসংখ্য পাহাড়ে বেড়িয়েও পাহাড় দেখার আনন্দ আমার একটুও কমল না।

সহর ছেড়ে মিনিট পনেরো বিশ হেঁটে পাহাড়টিতে এসে পৌঁছলাম। পাহাড়টিকে আমার কল্পনায় যতটা সুন্দর দেখেছিলাম, বাস্তবে তা' নয়। অনেক কিছুর মত পাহাড়কেও দূর থেকে দেখতেই সুন্দর লাগে বেশী, নিকটে গেলেই সব খুঁত চোখে পড়ে। যেমন দূর থেকে বরফাচ্ছাদিত গিরিচূড়া দেখতে কতই না লোভনীয়, কিন্তু সেই বরফের উপরে গিয়ে দাঁড়ালে আর তত সুন্দর, তত আকর্ষণীয় মনে হয় না।

বাগানটির বহু প্রশংসা শুনে শুনে মনে মনে নন্দন কাননের অনুরূপ কিছু আমি ভেবেছিলাম, কিন্তু পাহাড়ে চড়ে বাগানের অভ্যন্তরে পদার্পণ করেও যখন আমাকে জিজ্ঞেস করে জানতে হল যে সেটাই বাগান, তখন আমি সত্যই আশ্চর্য্য হলাম। কোথায় দেখব—সাজানো গোছানো ফলফুলে শোভিত সুন্দর বাগান, আর কোথায় দেখলাম বড় বড় বৃক্ষে শোভিত পাহাড়ের শীর্ষদেশের মধ্যভাগে একটি ফোয়ারা আর দু-একটি খোয়া দেওয়া রাস্তা, রাস্তার পাশে দু-একটি ফুলের চাড়া, আর গাছের নীচে নীচে দু-একখানা বসবার বেঞ্চমাত্র। বুঝলাম—বাগানটি

তৈয়ারী হয় নি, তৈয়ারী আরম্ভ হয়েছে মাত্র। তবে বাগানের যায়গাটি যে মনোরম, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

পাহাড়ে এত গাছ, ভাবলাম—কত রকমের কত পাখীই না যেন কিচ্‌মিচ্‌ শব্দে আমাদের উত্ত্যক্ত করে তুলবে। কিন্তু কোথাও কোন পাখী দেখলাম না, ঝি-ঝি পোকার শব্দ বা উপরে পাখীর কোলাহল—কিছুই শুনলাম না। ভাবলাম—এইখানেই ত আমাদের দেশের সঙ্গে ইউরোপের তফাৎ। আমাদের দেশ হলে ত কত রকমের কত পাখীর কোলাহলে চারিদিক মুখরিত হয়ে উঠত। আকাশের দিকে তাকিয়ে কত পাখীর ঝাঁক চোখে পড়ত। তা' দেখে নির্জ্জনে বসেও মনে মনে কত উল্লাস সৃষ্টি হত। কিন্তু ইউরোপের মাঠে ঘাটে নির্জ্জনে বসে ভাববার বিষয়বস্তুই কম চোখে পড়ে। আমার একবার মনে হল—"তবে কি এইজন্যই ভারতের লোক একটু ভাবুক বেশী, আদর্শবাদী বেশী ?"

বাগানে বেড়াতে বেড়াতে সঙ্গীকে আমি জিজ্ঞেস করলাম—"এই বাগানেরই কি আপনি এত প্রশংসা করেছিলেন কাল ?" "হ্যাঁ। কেন, আপনার ভাল লাগছে না ?"—তিনি উত্তর করলেন। আমি বললাম—"হ্যাঁ, স্থানটি ত বেশ, তবে বাগানটি কিন্তু এখনও তেমন হয় নি।"

বাগানের মালী বাগানের পাশেই একটি কুড়ে ঘরে থাকত। তার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিতে সে হল

মহাখুসী! সে কি দিয়ে যে আতিথেয়তার পরিচয় দেবে, তা' ভেবে ভেবে অবশেষে কতকগুলি বাদাম নিয়ে এল। এনে আমার হাতে দিতে তার সঙ্কোচভাব লক্ষ্য ক'রে আমিই গেলাম তার কাছে। সে বলল—"আমার ত আর কিছুই নেই, যা দিয়ে আপনার যোগ্য অভ্যর্থনা করতে পারি।" আমি বললাম—"তোমার বাদাম পেয়েই আমি খুব খুসী, দামী জিনিষেও এত খুসী হতাম না।" এতক্ষণে হাসিতে তার মুখখানা দীপ্ত হয়ে উঠল।

মিঃ স্থবেভ একটি পাথরের উপরে বাদামগুলি রেখে আর একটি পাথর দিয়ে ভাঙ্গতে লাগলেন। এই যে সদিচ্ছা প্রণোদিত মন-খোলা প্রাণ-খোলা ব্যবহার, যার মধ্যে কৃত্রিমতার নাম গন্ধও নেই, তা আমার খুব ভাল লাগল। সত্যই আমি ভুলে গেলাম যে একজন বিদেশীর সঙ্গে আমি বেড়াতে বেরিয়েছি। সত্য কথা বলতে কি, যেখানেই কৃত্রিমতার ছাপ, সেখানেই আমি স্বাভাবিক আনন্দবোধে হই বঞ্চিত।

বাগান ছেড়ে সহরে প্রত্যবর্ত্তনের জন্য আমরা উঠলাম। বেলা প্রায় তখন দশটা। মিঃ স্থবেভের সঙ্গে তাঁর বাড়ীতে যেতে তিনি আমাকে বিশেষ অনুরোধ জানালেন, কিন্তু আমি বললাম—"তা কি ক'রে হয়? সাড়ে দশটায় আমার যে একটা এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে।"

মিঃ স্থবেভ যেন আমাকে তাঁর বাসায় না নিয়ে কিছুতেই ছাড়বেন না। সাড়ে দশটায় এনগেজমেণ্টের কথা তাঁকে স্মরণ

করিয়ে দিলে তিনি মন্তব্য করলেন—“আমাদের (বুলগেরিয়ানদের) কথার কোন দাম নেই। কথা বলতে হয় বলি, কিন্তু তা' যে তেমন আগ্রহ নিয়ে রক্ষা করারও চেষ্টা করতে হয়, তা আমরা করি না। ইহা আমাদের জাতীয় চরিত্রের কলঙ্ক বিশেষ। আর আমাদের সময়ের জ্ঞান? আমরা সকল সময়েই আধঘণ্টা দেরী করি। সুতরাং আপনার সাড়ে দশটা মানেই আমাদের এগারোটা। আর ততক্ষণে আপনি হোটেলে প্রত্যাবর্ত্তন করতে পারবেন।” তিনি আরও বললেন—“কাল রাতে আপনার কথা আমার স্ত্রী ও ছেলেকে বলেছিলাম। বলতেই আপনাকে দেখার জন্য, যেভাবেই হোক আপনাকে বাসায় একবারটি নিয়ে যাবার জন্য আমাকে তারা করল অনুরোধ। আমিও তাদের কথা দিয়েছি, বলেছি যে আজ সকালে বাগান থেকে প্রত্যা-বর্ত্তনের পথে আপনাকে বাসায় নিয়ে যাব।” বলে একটু থামলেন, তারপর বললেন, “যদি আপনাকে সঙ্গে না নিতে পারি, তবে ত আমি লজ্জায় পড়ব।”

আমি আর দ্বিরুক্তি না ক'রে তাঁর প্রস্তাবে এখন স্বীকৃত হলাম। তিনিও হলেন খুব খুসী।

ভদ্রলোকের বাড়ীখানা ছোট্ট। নূতন তৈয়ারী, একতলা বাড়ী। কিন্তু ছোট্টর ভেতরেই বেশ সাজানো গোছানো। বাড়ীর চারপাশে ফুলের গাছ।

বাড়ীর দরজায় দাঁড়ানো ছিলেন মিঃ সুবেভের স্ত্রী, ছিলেন প্রতীক্ষায় উৎসুক দৃষ্টি নিয়ে। বাড়ী পৌঁছতেই তিনি আমাকে

করমর্দ্দন ক'রে অভ্যর্থনা করলেন। সারাটি মুখমণ্ডল তাঁর হাসি আর খুসীতে দীপ্ত হয়ে উঠল। আমার সঙ্গে দু-একটি কথা বলতে তিনি হলেন উদগ্রীব, কিন্তু তাঁর সেই বাসনা তৃপ্ত হল না। কারণ ইংরাজী তিনি জানতেন না।

কিছুক্ষণ বসে তিনি উঠে ভিতরে গেলেন, ফিরলেন কিছু মিষ্টি আর কফি নিয়ে। মিষ্টান্নের মত আরও এক প্রকার অতি উপাদেয় খাদ্য তিনি নিয়ে এলেন। শুনলাম যে অনেক রাত জেগে তিনি আমার জন্য এগুলি তৈয়ারী করেছিলেন। আমাকে অভ্যর্থনার জন্য এই যে আয়োজন, ইহার তেমন কোন স্বার্থকতা না থাকলেও ইহার মধ্যে যে আন্তরিকতা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে, তাতে আমি অভিভূত হলাম বেশী। এখন বুঝলাম যে আমি না এলে, কত দুঃখই না মিসেস সুবেভ পেতেন।

শুনে আমি আশ্চর্য্য হলাম যে তাঁরা সকলেই নিরামিষাশী। মাছ মাংস বা মদ কিছুই তাঁরা খান না। ধূমপানও তাঁরা কেউ করেন না। কোনও ব্যাধির কারণে তাঁরা মাছ মাংস মদ ছাড়েন নি, তাঁরা সম্পূর্ণ নৈতিক কারণেই নিরামিষাশী হয়েছেন। ইউরোপের মধ্যে এরাই যে একমাত্র নিরামিষাশী, তা কিন্তু নয়। বহু শ্রদ্ধেয় বরেণ্য ব্যক্তিও নিরামিষাশী ছিলেন বা আছেন, যেমন বার্ণার্ড-শ' ও স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্ ছিলেন নিরামিষাশী। অবশ্য শেষোক্ত ব্যক্তি নিরামিষাশী ছিলেন পেটের বিশেষ অসুখের কারণে। বিলাতে নিরামিষ ভোজনের প্রচারকারী সমিতিও রয়েছে।

মিঃ সুবেভের ধারণা যে প্রত্যেক ভারতবাসীই নিরামিষাশী। সুতরাং আমি নিরামিষাশী নই—জেনে তাঁরা হলেন আশ্চর্য্য।

প্রায় আধ ঘণ্টা গল্পগুজব ক'রে যখন আমি বিদায় নিয়ে উঠতে যাব, এমন সময়ে এল মিঃ সুবেভের একমাত্র ছেলে ইয়ানচো। ইয়ানচো সকাল বেলায় স্কুলে গিয়েছিল। (গ্রীষ্ম-কালে বুলগেরিয়াতে সকালবেলায় স্কুল বসে)। বয়সে সে ছিল মাত্র বছর আটেকের। বাড়ীতে একজন বিদেশীকে দেখে তার কিছুমাত্র ভয় বা সঙ্কোচ হল না। বই রেখে সে দৌড়ে এল আমার কাছে, যেন আমি তার কত কালের পরিচিত। সে আমাকে 'কাকা' বলে সম্বোধন করে আমাকে তার আরও পরম আত্মীয় ক'রে তুলল। আমি বুঝি আর না বুঝি, কত প্রশ্ন, কত কথা সে আমাকে বলতে লাগল।

প্রায় আধ ঘণ্টা গল্প গুজবে কাটিয়ে আমি উঠলাম। মিসেস সুবেভ এসে পরদিন দুপুরে তাঁদের বাসায় খেতে বিশেষ অনুরোধ জানালেন। আমি সম্মত হয়ে তাড়াতাড়ি তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

হোটেলে ফিরলাম, কিন্তু ঘণ্টাখানেক দেরীতে। সুতরাং অপেক্ষমান ভদ্রলোকদের নিকট এইজন্য মাপ চেয়ে আমি হেসে মন্তব্য করলাম—"শুনলাম, বুলগেরিয়ার সময় নাকি ঘণ্টা খানেক পিছিয়ে চলে। তাই আমার দেরী হয়েছে, একথা কিন্তু আপনারা বলতে পারেন না।" ভদ্রলোকদের একজন হেসে

উঠলেন, বললেন—"না, বুলগেরিয়ার সময় এক ঘণ্টা পিছিয়ে চলে না, চলে মাত্র আধ ঘণ্টা পিছিয়ে। সুতরাং আপনি আধ ঘণ্টা দেরী করেছেন।" "তবে এই দেরীটুকুর জন্য আমি আপনাদের নিকট মাপ চাইছি।"—আমি উত্তর করলাম।

মধ্যাহ্নে হোটেলের সন্নিকটবর্ত্তী একটি রেস্তরাঁয় আহারের জন্য উপস্থিত হলাম। আমার টেবিলে একটি পরিচারক এল। কি কি খাদ্য আমি চাই—ইংরাজীতে তাকে আমি বললাম। আমার কথার বিন্দুবিসর্গ কিছুই না বুঝে সে এগিয়ে দিল একটি মেনু (খাদ্য তালিকা)। মেনু দেখে আন্দাজ কিছুটা করতে পারলাম বটে, তবে ভাবলাম—"কি চাইতে আবার কি চাইব, কে জানে। অনর্থক আমার কিছু পয়সা হবে নষ্ট।" আমার এই অসুবিধা বুঝতে পেরে পাশের টেবিলের একটি যুবক উঠে এসে আমাকে বলল—"আপনাকে আমি কিছু সাহায্য করতে পারি কি?" বলা বাহুল্য, যুবকটি ইংরাজী জানত। সোফিয়াতে আমেরিকান কলেজের ছাত্র সে। মা আর এক বোনকে সঙ্গে করে এসে সে পাশের টেবিলে খেতে বসেছিল।

যুবকটি তার টেবিলে আর ফিরে গেল না। সে তার মা আর বোনের অনুমতি নিয়ে তার খাবার থালাবাটি নিজেই আমার টেবিলে এনে আমার পাশে খেতে বসল।

যুবকটির বাড়ী একটি গ্রামে, এখানে এসেছে সোফিয়ার ট্রেন ধরবার জন্য। মা ও বোন সঙ্গে এসেছে তাকে ট্রেনে উঠিয়ে

দেবার জন্য। অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে, নিজেদের মোটরেই এসেছে।

খাবার পর যুবকটির মা বোন গেল তাদের একজন আত্মীয়ের বাড়ী দেখাসাক্ষাতের জন্য, কথা রইল যে সে সোজা রেল স্টেশনে যাবে। কিন্তু খাবার পরে সে সোজা স্টেশনে না গিয়ে আমার সঙ্গে চলল থানায়। সহরে আমি কবে কোত্থেকে এসেছি, আর কবে সহর ছেড়ে কোথায় যাব—এই সংবাদটি জানাতে থানায় আমার উপস্থিতির প্রয়োজন ছিল। সেখানে সঙ্গী যুবকটি করল দোভাষীর কাজ।

থানা থেকে স্টেশনে রওনা হলাম, ছেলেটিকে এগিয়ে দেবার জন্য। ট্রেনের সময় হয়েছে, কিন্তু প্ল্যাটফর্মে ছেলে নেই দেখে যুবকটির মা হল ভীষণ ক্রুদ্ধ।

ট্রেনটি আসবার মিনিট কয়েক পূর্ব্বেই এসে আমরা স্টেশনে পৌঁছলাম। কিন্তু ছেলেটিকে দেখামাত্র তার মা তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল। চারিদিককার ভদ্র অভদ্র যাত্রীসাধারণ কা'রও প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ না ক'রে সকল শিষ্টাচার জলাঞ্জলি দিয়ে সে স্বর সপ্তমে উঠিয়ে ছেলেকে তিরস্কার করল। ছেলেটি নির্ব্বাক, নিস্তব্ধ হ'য়ে মাথা নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইল, কোন কথার কোন প্রত্যুত্তর দিল না। দেখে আমার বড্ড দুঃখ হল।

ট্রেন এল। ট্রেনে উঠবার আগে ছেলেটি আমার কাছে এসে করমর্দ্দন ক'রে মন্তব্য করল—"আমাকে মাপ করবেন, আমি বড়ই দুঃখিত।"

পরদিন মধ্যাহ্নে সময়মতই গিয়ে মিঃ স্থবেভের বাড়ী পৌঁছলাম। পৌঁছতেই বাড়ীর সকলে এসে আমাকে করমর্দ্দন ক'রে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করল। সরল সোজা অভ্যর্থনায় আমিও মুগ্ধ হলাম।

একটি খাবার টেবিলের চারধারে আমরা সকলে বসলাম। বাড়ীতে কোন ঠাকুর চাকর না থাকায় সকল কাজ একহাতে মিসেস স্থবেভই করেন। তিনিই তাই খাবার জিনিষপত্র সব টেবিলে নিয়ে এলেন। এসে তিনিও আমাদের সঙ্গে একই টেবিলে খেতে বসলেন।

সম্পূর্ণ নিরামিষ খাদ্য। শাকশব্জির ঝোল (সুপ), আলু-ভাজা, কয়েক রকমের তরকারী, আর আমার জন্য বিশেষভাবে তৈয়ারী খুব বড় একটা কাঁচা লঙ্কার মধ্যে পোলাও, মিষ্টান্ন প্রভৃতি। খেয়ে বেশ তৃপ্তি বোধ হল।

খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম করতে বসেছি, এমন সময়ে বীণা হস্তে ইয়ানচো এসে হাজির হল। বীণা বাজিয়ে সে আমাকে দেখাবে যে কত সুন্দর সে বাজাতে পারে। একটি স্থরবিতানের বই উঁচু একটি স্ট্যাণ্ডে রেখে স্থরলিপি দেখে দেখে সে মহানন্দে বাজাতে লাগল। বাজাতে বাজাতে স্থরের সঙ্গে সঙ্গে তার মুখের ভাবভঙ্গীও পরিবর্ত্তিত হতে লাগল।

এক-একটি সুর বাজনা শেষ হয়, আর মুখে চোখে হাসি নিয়ে সে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে,—"কেমন লাগল

কাকা ?' আমার উত্তর শুনে আরও উৎসাহিত হয়ে ওঠে সে, উৎসাহের প্রাবল্যে আরও সে বাজাতে লাগে।

বাজনা শেষ করে সে আমার কাছে এসে গা ঘেঁসে বসল, যেন তার কত আপন আমি। আমাদের এই পারস্পরিক স্নেহ ভালবাসায় আমাদের ভাষার পার্থক্য বা দেশের দূরত্ব কোন ব্যবধান রচনা করতে পারল না। সত্যই আমরা পরস্পরের আপন হয়ে উঠলাম।

বুলগেরিয়ার প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সেতার বা বীণা বাজনা শিক্ষা দেওয়া হয়। ফলে, ভূগোল ইতিহাস অঙ্কের এক ঘেয়ে আনন্দহীন পড়ার মধ্যে মধ্যে বাজনা শিক্ষার ব্যবস্থা থাকায় ছেলেমেয়েদের নিকট স্কুল বরং শিক্ষার সঙ্গে আনন্দ উপভোগের স্থান বলেই বিশেষ সমাদৃত হয়। আমার মতে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি ছাত্রের বিশেষ রুচি ও ঝোঁক অনুযায়ী বিশেষ বিষয়ের জ্ঞান অনুশীলনের দিকে সচেষ্ট হলে বিশেষ সুফল লাভ হয়। বিশেষ বিষয়ে বিশেষ পারদর্শীতা লাভে ছাত্রকে সাহায্য করলে ছাত্র এবং জাতি উভয়েই উপকৃত হয়।

ইয়ানচো আমার গা ঘেসে বসে আমার দৃষ্টি একটি ক্যালেণ্ডারের দিকে (ক্যালেণ্ডারটিতে একটি হাতীর ছবি ছিল।) আকর্ষণ করে বলল—"কাকু, পরের বার আসবার সময়ে ঐ ধরণের একটা সুন্দর হাতী নিয়ে আসবেন ত ?" আমি

মাথা নেড়ে উত্তর করলাম—"হ্যাঁ, আনব।" আর অমনিই মহানন্দে উঠে গিয়ে সে মা বাবার মাঝখানে বসে তাঁদেরকে জানিয়ে দিল—"কাকু, আমার জন্য একটি হাতী নিয়ে আসবেন।"

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে হোটেলে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য উঠে দাঁড়ালাম, কিন্তু যাবার পূর্ব্বে মিঃ স্নুবেভকে সপরিবারে সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে একটি সিনেমায় যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে গেলাম।

সন্ধ্যায় সহরের শ্রেষ্ঠ সিনেমায় এসে উপস্থিত হলাম, আমার সঙ্গে মিঃ স্নুবেভ ও তাঁর ছেলে ও স্ত্রী।

সিনেমা ভবনটি কলকাতার সাধারণ একটি সিনেমা ভবনের মতই। কিন্তু আমাদের দেশ অপেক্ষাও এখানকার বিভিন্ন শ্রেণীর প্রবেশ-মূল্য অনেক কম। সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন শ্রেণীর টিকিটের মূল্য মাত্র দু আনার মত। এত কম মূল্য হলেও কিন্তু সিনেমায় দর্শকের খুব যে ভীড় হয়, তা' নয়। বোধ হয় সহর ও লোকসংখ্যা অনুপাতে সিনেমা থিয়েটার, নাচঘর প্রভৃতির সংখ্যা এখানে অনেক বেশী।

সিনেমা ভবনে প্রবেশ ক'রে আমাদের আসনে আমরা বসলাম। কিন্তু ফিল্ম আরম্ভ হওয়ার কোন লক্ষণই চোখে পড়ল না। ঘড়ি দেখি আর ভাবি—"নির্দ্দিষ্ট সময় পার হয়ে গেল, কিন্তু ফিল্ম দেখানো আরম্ভ হয় না কেন?" মিঃ স্নুবেভকে ইহার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি হেসে মন্তব্য করলেন—

"পূর্ব্বেই ত বলেছি আমাদের সময়ানুবর্ত্তিতা সম্বন্ধে। ফিল্ম দেখানো আরম্ভ হবে নির্দ্দিষ্ট সময়ের প্রায় আধ ঘণ্টা পরে। কারণ দেখছেন না—আসনগুলি সব এখনও খালি পড়ে আছে। দর্শকরা এখনও আসে নি। নির্দ্দিষ্ট সময়ে আরম্ভ হবে না বলেই তারাও দেরী করে আসে।" আমি বললাম—"না, আপনার বলা উচিত যে দর্শকরা নির্দ্দিষ্ট সময়ে আসে না বলেই ফিল্ম দেখাতেও দেরী হয়।" মনে মনে আমি ভাবলাম—"যে ইউরোপের নিয়মানুবর্ত্তিতা ও সময় জ্ঞানের প্রশংসা আমরা এত করি, সেই ইউরোপেরই একটি দেশে লোকের এইরূপ সময়ের জ্ঞান!"

পরদিন ছিল একটি উৎসব দিবস, "গ্র্যাপ্‌স্‌ ফেস্টিভ্যাল বা আঙ্গুর ফলের উৎসব" বলে ইহা পরিচিত। নানা রকমের আমোদ আহ্লাদে অধিবাসীরা দিনটি কাটায়।

এখানকার নূতন পরিচিত জনকয়েক বন্ধু বান্ধবী সন্ধ্যায় একটি নাচঘরে আমাকে আমন্ত্রণ জানাল। আমন্ত্রণ পেয়ে আমি পড়লাম মুস্কিলে। আমন্ত্রণ রক্ষা না করাটা দেখায় চরম অভদ্রতা, আর রক্ষা করতে গেলে নাচ না জানায় পড়ি বিপাকে। মনে মনে ভাবলাম—"প্রথমটায় হবে আমাদের দেশের বদনাম, আর দ্বিতীয়টাতে হব শুধু আমি একা নাকাল।" দেশের বদনাম অপেক্ষা নিজের নাকাল হওয়া অপেক্ষাকৃত ভাল মনে ক'রে আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম।

নাচঘরে এলাম। জোড়ায় জোড়ায় বহু যুবক যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধার সমাবেশ হয়েছে। প্রেমিক প্রেমিকা, স্বামী স্ত্রী সকল রকম লোকই রয়েছে সেখানে। সকলেই বিচিত্র বর্ণের সাজ-সজ্জায় সজ্জিত। তাদের মুখে চোখে, কথাবার্ত্তায় আনন্দ উথলিয়া পড়ছে। এই উৎসবে যে-কোন স্ত্রী যে-কোন পুরুষের সঙ্গে বা যে-কোন স্বামী যে-কোন মেয়ের সঙ্গে নাচতে সঙ্কোচ বোধ করে না বা তা'তে কোন দোষও মনে করে না। ইহা সম্পূর্ণ একটি সামাজিক উৎসব।

একজন বিদেশীকে নাচের আসরে উপস্থিত হতে দেখে অনেকেই হল বিস্মিত। সেই বিস্ময় অল্পক্ষণের মধ্যেই দূর হল আমার আমন্ত্রণকারী বন্ধুবান্ধবীর সহায়তায়। অনেকে আমার সঙ্গে একটু কথা বলার জন্য উৎসুকও হল। কিন্তু সময় আর সুযোগ অভাবে তা' সম্ভব হল না।

বাজনা বেজে উঠল। আর জোড়ায় জোড়ায় স্ত্রীপুরুষ আসরে নাচ করতে নেমে পড়ল। এদিকে পাশেই আমরা কয়েক-জন ডিনার (রাত্রির খাওয়া। কোন কোন দেশে উহা মধ্যাহ্নের খাওয়াকেও বুঝায়। ভারি খাওয়াকে ডিনার বলে।) খেতে বসলাম। খেতে খেতে বাজনার সুমধুর লীলায়িত তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে হর্ষোৎফুল্ল নারীপুরুষের নৃত্য দেখতে বেশ ভালই লাগল। কিন্তু খাওয়া যতই শেষ হয়ে আসতে লাগল, ততই আমার মনে দুশ্চিন্তা বাড়ল। মনে মনে কেবল ভাবি—"খাওয়া শেষ হলেই ত বান্ধবীর দল একে একে এসে হাত ধরে নাচতে চাইবে।

তখন আমি কি করব, আর কি বলব ? নাচের ত ন-ও আমি জানি না, পা উঠিয়ে ফেলব কি ক'রে—তাও ত জানি না।" মনে মনে ভীষণ লজ্জিত হলাম, কিন্তু কিছুই ঠিক করতে পারলাম না যে কেউ এসে অনুরোধ জানালে—কি ব'লে আমাকে রেহাই দিতে তাকে বলব।

ডিনার খাওয়া শেষ হল। শেষ হতে না হতেই ইংরাজী জানা সোফিয়া কলেজের একটি ছাত্রী এসে আমার সঙ্গে করমর্দ্দন করল, আর সেই কর না ছেড়েই বলল—"চলুন, একটু নাচি।" সঙ্গে সঙ্গে আর কোন উপায় না দেখে আমি উত্তর করলাম —"আসবার পথে একটি গর্ত্তে পড়ে গিয়ে পায়ে আমার চোট লেগেছে, দেখছেন না খোঁড়িয়ে হাঁটছি। আমি খুব দুঃখিত যে আপনার সঙ্গে নেচে উৎসবের নির্ম্মল আনন্দটুকু ভোগ করতে পারলাম না।" প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে এমন নৈরাশ্যজনক উত্তর সে বোধ হয় আমার কাছ থেকে আশা করেনি। তা' ছাড়া আনন্দ উৎসবের সূত্রপাতেই প্রত্যাখ্যাত হওয়া মোটেই সুখকর নয়। কিন্তু আমার উপায়ন্তরও ছিল না। কিছুক্ষণ পর পর আরও কয়েকটি মেয়ে ঐ একই প্রস্তাব নিয়ে আমার কাছে এল, কিন্তু সকলকেই শোনাতে হল একই বাণী। একজন ত দুঃখিত হয়ে বলেই ফেলল—"তবে আর এত ব্যথা বেদনা নিয়ে এলেনই বা কেন ?"

সবশেষে এলেন মিসেস স্তুবেভ। তাঁকেও ঐ একই কথা বলতে তিনি যেমন হলেন দুঃখিত, তেমনই হলেন চিন্তিত।

তাড়াতাড়ি তিনি দেখতে চাইলেন—কোথায় আমার ব্যথা লেগেছে। আমার উত্তর না শুনেই তিনি বললেন—"চলুন আমার বাড়ী, গিয়ে একটু ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করি।" "কিন্তু উৎসবের এই আনন্দটুকু থেকে ত আপনি হবেন বঞ্চিত," —আমি উত্তর করলাম। "তা হোক্ গে,"—বলে তিনি আমাকে তার সঙ্গে চলতে করলেন অনুরোধ। আমি তাঁকে বুঝিয়ে শান্ত করলাম, বললাম, "আপনাদের নাচ শেষ হোক, তারপর যেতে হয় যাব। আপনাদের উৎসবের আনন্দটুকু চা পান করতে করতে একটু উপভোগ করতে দিন।" এইভাবেই নানা অজুহাত সৃষ্টি ক'রে বিপদ থেকে রক্ষা পেয়ে গেলাম।

নাচের উৎসব যখন শেষ হল, রাত তখন বারোটা। মধ্যরাত্রির নিস্তব্ধতা সহরের বুকে বিরাজ করছে। পরদিন প্রত্যুষে সহর ছেড়ে বিদায় নেব—এই সংবাদটি পরিচিত সকলকে জানিয়ে তাদের কাছ থেকে বিদায়সূচক শুভেচ্ছা গ্রহণ ক'রে ও তাদেরকে জানিয়ে তাড়াতাড়ি হোটেলে প্রত্যাবর্ত্তন করলাম।

বেশী রাত্রে শোয়ায় এমন ঘুমই হল যে সকাল সকাল আর ওঠা হল না। ঘুম যখন ভাঙল, বেলা তখন প্রায় সাড়ে সাতটা। আধ ঘণ্টার মধ্যেই প্রস্তুত হয়ে নিলাম। মিঃ সুবেভ ছেলে আর স্ত্রীকে সঙ্গে করে আমার ঘরে এসে উপস্থিত হয়েছেন। আমাকে শুভেচ্ছাসূচক উপহার দেবার জন্য অনেকগুলো আঙ্গুর আর ফুলের দুটি সুন্দর তোড়াও তাঁরা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন

আরও লোক কিছু কিছু ফুল এনে আমাকে উপহার দিল। সকলেই চিঠিপত্র লেখার জন্য আমাকে বিশেষ অনুরোধও জানাল।

সুবেভ-পরিবার ও অন্যান্য উপস্থিত বন্ধু বান্ধবীদের সঙ্গে করমর্দ্দন করে সকলের শুভেচ্ছা নিয়ে আমি সাইকেলে উঠে পড়লাম। কিন্তু মনটা বড়ই খারাপ হল। সত্য কথা বলতে কি, চোখে আমার জল এসে গেল। আর শুধু আমার চোখেই নয়, সুবেভ-পরিবার এবং অন্যান্যদের চোখে মুখেও বিদায়-কালীন বিষাদের ছায়া প্রকাশ হল।

খানিক দূরে যাই, আর পেছনে তাকাই। আর অমনি সকলে রুমাল উড়িয়ে, কেউ বা হাত নেড়ে শুভেচ্ছা ও প্রীতি প্রকাশ করতে লাগল। অল্পক্ষণের মধ্যেই পরস্পর পরস্পরের অদৃশ্য হলাম। অদৃশ্য হলাম বটে, কিন্তু কিসের মায়া যেন আমাকে পেছনে টানে! মনে মনে ভাবলাম—"না, আর নয়। এমনভাবে লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে বিচ্ছেদের তীব্র যাতনা ভোগ আর করব না, আর কোথাও এমনভাবে লোকের সঙ্গে মিশব না, হাসব না, খেলব না। তবেই মায়ায় আবদ্ধ হয়ে আর কাঁদতেও হবে না।" "দুটো দিনের জন্য এসেছি, জীবনে আর ত আসার সুযোগ হবে না, দেখাও হবে না, তবে আর এমন মিছে মায়ায় কেন আবদ্ধ হব?" এমনভাবে যতই ভাবলাম, মনটা ততই খারাপ হল। মনের এই বিষাদের ভাবকে দূর করার জন্য দ্রুত চলতে সুরু করলাম, দূর দূরান্তের গাছপালা

পাহাড়ের শান্ত সুন্দর স্নিগ্ধ দৃশ্য দেখে মন ভোলাতে চেষ্টা করলাম, আশে পাশের ক্ষেত খামারের কৃষকদের দিকে তাকিয়ে চিন্তার মোড় ফেরাতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু বৃথাই হল আমার সকল চেষ্টা, সকল শ্রম। কোন কিছুতেই আর শান্তি পেলাম না। কেবল বিগত দিনগুলি স্মৃতিপটে ক্রমেই বেশী উজ্জ্বল হয়ে উপস্থিত হতে লাগল। ফলে চলার পথও ক্রমেই বেশী ক্লেশকর মনে হল।

চলেছি আমি ভার্ণা, প্রায় দুদিনের পথ। ভার্ণা দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্দরই শুধু নয়, ইহার দৃশ্যবলীও নাকি সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। ইহাকে তাই বলা হয় কৃষ্ণসাগরের রাণী (**The Queen of the** Black Sea)। সমুদ্রস্নানের শ্রেষ্ঠ যায়গা বলেও ইহার খ্যাতি সর্ব্বত্র। স্বভাবতঃই এমন একটি সহর দেখবার আগ্রহ আমার হল খুব।

যতই সহরের নিকটবর্ত্তী হতে লাগলাম, ততই কিন্তু সহর সম্বন্ধে আমার গভীর ঔৎসুক্য সৃষ্টি হল।

দুদিন সাইকেল ঠেলে ভার্ণা সহরে এসে পৌঁছলাম। পৌঁছেই একটি হোটেলে উঠলাম। হোটেলটির নাম স্প্লেণ্ডিড্ (Splendid)। বেশ বড় হোটেল। ঘর ভাড়া দিতে হল দৈনিক পঞ্চাশ লেভা।

এতদিনে এই দেশের এমন একটি সহরে এসে পৌঁছলাম, যা দেখে সত্যই আমার ভাল লাগল। সহরটি যে খুব বড়, তা'

নয়, মাত্র আশী হাজার লোকের বাস। আর ভাল ভাল অনেকগুলি হোটেল রেস্তরাঁ আছে বলেই যে সহরটি আমার ভাল লাগল, তাও নয়। ইহার দৃশ্যাবলী বিশেষতঃ সম্মুখের ঐ নীল সমুদ্রই ইহাকে করেছে এক অপরূপ শোভায় সমৃদ্ধ। সহরটির রাস্তাঘাট বাড়ীঘর আধুনিক ধরণের। কয়েকটি রাস্তার দুপাশে বৃক্ষের সারি, দেখতে বেশ ভালই লাগে। একটি নূতন সহর বলে একে মনে হলেও ইহা কিন্তু মোটেই নূতন নয়। এই সহরের অস্তিত্ব প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বেও ছিল। সুতরাং খুব পুরানো সহর। আর পুরানো অনেক সহরের মত এই সহরেরও বহু ভাগ্য বিপর্য্যয় ঘটেছে। নামেরও বহু পরিবর্ত্তন ঘটে শেষ পর্য্যন্ত ভার্ণা নাম গ্রহণ করে ইহা আজ বিশ্ববাসীর নিকট পরিচিত হয়েছে। বিখ্যাত ক্রিমিয়ার যুদ্ধকালে এই সহরে ইংরাজ ও ফরাসী বাহিনীর একটি সৈন্যাবাস ও একটি দুর্গ ছিল।

সেই সকল বিগত স্মৃতিকথা আজও ইহার পুরানো দালান-কোঠা, যাদুঘরগুলি ও বিভিন্ন গীর্জ্জা বহন করে চলেছে।

সহরের যে অংশে বন্দর, সেখানে একটি বিরাট মূর্ত্তি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মূর্ত্তিটি বুলগেরিয়ার মুক্তিদাতা রুশরাজ জার ফার্দ্দিনান্দের।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সহরে পৌঁছলাম বটে, তবে পথ চলায় বড়ই ছিলাম ক্লান্ত। তাই সন্ধ্যায় সমুদ্র সৈকতের মনু

ভোলানো দৃশ্য দেখবার আগ্রহ থাকলেও অবসন্ন দেহ নিয়ে তা ভোগ করা সম্ভব হল না। হাতমুখ ধুয়ে, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই খাওয়া দাওয়া শেষ করে বিশ্রাম করতে বসে যে ঘুমিয়ে পড়লাম, সেই এক ঘুমেই রাত ভোর হল।

পরদিন সকালে চা পান ক'রে প্রথমে সহরটিকে একবার প্রদক্ষিণ করতে বেরুলাম। আর দেখতে গিয়ে সহরের পুরানো বাসস্থান, নূতন বসতি, ব্যবসাকেন্দ্র, অলিগলি কিছুই বাদ দিলাম না। ঐতিহাসিক গীর্জ্জাগুলিও একবার করে দেখে নিলাম। জাহাজ মেরামতের যায়গা, নদী আর সমুদ্রের সঙ্গমস্থান, সকলই দেখলাম। সহরের হোটেল রেস্তরাঁ, বার কাফে, নাচঘর কোন কিছুই আমার দৃষ্টি এড়াল না। কিন্তু গেলাম না সমুদ্রের প্রশস্ত সৈকতে। মনে মনে ভাবলাম—"আগে দেখব না, সৌন্দর্য্য উপভোগে তবে ব্যাঘাত ঘটবে। সমুদ্রে সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের মনোমুগ্ধকর দৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গে কলকোলাহলে মুখরিত সৈকতের দৃশ্যও একই সঙ্গে দেখব।"

অপরাহ্ণে সমুদ্র সৈকতে রওনা হলাম। পারে একটি লম্বা প্রশস্ত রাস্তা, রাস্তার পাশে বৃক্ষশোভিত বাগান। মাঝে মাঝে এক এক সারি সিঁড়ি উপর থেকে নীচে বেলাভূমিতে নেমেছে। এক যায়গায় একটি পোল সমুদ্রের খানিকটা অভ্যন্তর পর্য্যন্তও রয়েছে। চারিদিকে তার রেলিং। এই স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে বা বসে সমুদ্রের হাওয়া খেতে বড়ই চমৎকার,

তবে দিনরাত আবালবৃদ্ধবনিতায় এই যায়গাটি থাকে জনাকীর্ণ। স্নানের পোষাকে বহু লোক এখানে বসে রৌদ্র-স্নানও করে।

সৈকতে অনেকগুলি স্নানাগার রয়েছে। সেখানে সমুদ্রের জলে বা পরিষ্কার পানীয় জলে স্নানের বন্দোবস্ত রয়েছে। গরম ঠাণ্ডা উভয় প্রকার জলে এবং সাওয়ারে স্নানের সুবিধাও আছে। এইজন্য অবশ্য মূল্য দিতে হয়, মূল্য দিতে হয় প্রথম শ্রেণীর কেবিনে পনেরো লেভা, দ্বিতীয় শ্রেণীর ঘরে আট লেভা, আর তৃতীয় শ্রেণীর জন্য দিতে হয় পাঁচ লেভা। তদতিরিক্ত প্রবেশ মূল্য বাবদ দিতে হয় তিন লেভা। আর মাঝে মাঝে বা দৈনিক স্নানের অভিলাষী যারা, তাদের জন্য রয়েছে মাসিক বা ত্রৈমাসিক টিকিটের ব্যবস্থা।

প্রচুর রোদ, স্নানের সুব্যবস্থা, মনোরম দৃশ্য আর সমুদ্র বা নদীতে বেড়ানোর বিশেষ বন্দোবস্ত থাকায় স্বভাবতঃই দেশের সকল স্থান থেকে হাজার হাজার দর্শকের এখানে আগমন হয়। বহু বিদেশী পর্য্যটকও এখানে আসে। আর এই বিদেশী পর্য্যটক বা দর্শকের সংখ্যা যাতে অত্যধিক বৃদ্ধি পায়, সে-বিষয়ে সরকার ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যথাসাধ্য চেষ্টাও করে। বিদেশীদের বহু সংখ্যায় আকৃষ্ট করবার উদ্দেশ্যে তাদের জন্য রেল ষ্টীমার জাহাজের ভাড়াও অত্যধিক হারে কমিয়ে দেওয়া হয়। ফলে বহু বিদেশী পর্য্যটক আসায় জাহাজ ষ্টীমারের ভাড়া হিসাবে কিছু কম আয় হলেও দেশের জনসাধারণ হয়

বেশী লাভবান। কারণ কম ভাড়ার জন্য যাতায়াতে বিদেশীদের যে টাকা বাঁচে, তদপেক্ষা বহু গুণ তারা হোটেলে রেস্তরাঁয়, বা কাফে বার প্রভৃতিতে খরচ করে যায়। সুতরাং দেশের পক্ষে ইহাও একটি লাভজনক ব্যবসা বিশেষ। আর এই দেশেতেই শুধু নয়, পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতেও টুরিস্ট-ট্র্যাফিককে একটি ব্যবসা হিসাবেই গণ্য করা হয়।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে সমুদ্র পারে একটি বেঞ্চে এসে বসলাম। সম্মুখের ঐ প্রশস্ত বেলাভূমিতে অসংখ্য লোকের ভীড়। বাগানে, রাস্তায়, স্ট্যাণ্ডে—সর্ব্বত্রই ছোট বড় অসংখ্য লোকের আনাগোনায় সমুদ্রের পার কলকোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠেছে। কৌতূহলী ছেলে মেয়ের দল সমুদ্রের একটি ঢেউ নেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বালুরাশিতে কেউ বা দাগ কেটে, কেউ বা গর্ত্ত খুড়ে রেখে দূরে সরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বিরাট ঢেউ পারে এসে সশব্দে ভেঙ্গে পড়ল। ঢেউএর জল উপরে উঠে নেমে যাবার কালে সকল দাগ সকল গর্ত্ত বুজিয়ে সমতল করে রেখে গেল। আবার ছেলে মেয়েদের একই রকমের গর্ত্ত খোড়া আর দাগ কাটা চল্‌ল, ঢেউও পর পর এসে তা' বুজিয়ে যেতে লাগল। যেন ঢেউ আর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলা চলেছে। কেউ কেউ ঝিনুক কুড়িয়েও ফিরল।

একটি ছোট্ট নৌকায় মোটর লাগিয়ে সমুদ্রের মধ্যে জনকয়েক তরুণ তরুণী বেড়াতে বেরুল। মোটরের গতিবেগে নৌকাটি যেন উড়ে চলল।

একদল দর্শক দূর দূরান্তের ঐ কৃষ্ণবর্ণের পাহাড়শ্রেণী দেখে আনন্দ ও তৃপ্তি বোধ করতে লাগল, আর আমি গাছের নীচে বসে অস্তমিত সূর্য্যের দিকে তাকিয়ে আছি। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি—আকাশের গায়ে পাতলা মেঘের উপরে কত রংবেরংএর খেলা।

উদয়ের কালে সূর্য্য যেমন সমুদ্রের অদৃশ্য অতল তল থেকে হঠাৎ একটি লাফে জলের অনেকটা উপরে আকাশের গায়ে এসে দেখা দেয়, অস্ত গমনকালে তেমনটি হল না। দেখা গেল —সূর্য্য পরিষ্কার পশ্চিম আকাশের গা বেয়ে ধীরে ধীরে সমুদ্রের জলে ডুবে যেতে লাগল। একবারেই সূর্য্যের সবটুকু ডুবে গেল না, ডুবে অদৃশ্য হতে লাগল একটু একটু করে, যেন পৃথিবীর মায়া ছাড়তে সূর্য্যদেব মানুষের মতই কত অনিচ্ছুক! সূর্য্য ডোবে, আর ধীরে ধীরে চারিদিককার আধার গাঢ়তর হয়। বিশেষতঃ সমুদ্রের ঐ নীলজল গভীর কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করল।

সন্ধ্যা হল, চারিদিকে রাস্তার আশে পাশে গাছের ফাঁকে ফাঁকে সারি সারি আলো জ্বলে উঠল। এই দৃশ্যও দূর থেকে দেখতে বেশ ভালই লাগল।

দুজন সমবয়সী যুবক এসে আমার বেঞ্চে বসল। মনে হল, আমার সঙ্গে আলাপ জমাতেই যেন তাদের আগমন হল। আমার ধারণা মিথ্যা হল না।

পরিচয়ে জানলাম—একজন একটি স্থানীয় স্কুলের শিক্ষক, অপরজন একজন শিল্পী। শিক্ষক ভদ্রলোক ইংরাজী জানায়

আলোচনায় বিশেষ অসুবিধা হল না। কথায় কথায় তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন—"এই যায়গাটি আপনার কেমন লাগে?" উত্তর করলাম—"খুবই ভাল।" "হ্যাঁ, এমন সুন্দর সমুদ্রসৈকত, স্নানের বাঁধানো ঘাট, ঐ স্ট্যাণ্ড, রাস্তার পাশে সারি সারি গাছ, আর এমন বৃক্ষশোভিত বাগান আমাদের দেশের আর কোথাও কিন্তু নেই। এখানে যারা আসে, তারাই হয় মুগ্ধ।"—শিক্ষক মহাশয় বললেন। ক্ষণেক থেমে তিনি জিজ্ঞেস করলেন—"আচ্ছা, এমন সমুদ্রসৈকত আপনাদের দেশেও আছে কি?" সঙ্গে সঙ্গে সারা ভারতের সমুদ্র উপকূলের দৃশ্য ক্ষণেকের তরে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল, ভেসে উঠল ভারতের সারা পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম উপকূল ভাগ। পুরী, ভিজগাপট্টম (বিশাখাপত্তম), মাদ্রাজ, কন্যাকুমারী, কোচিন, তেল্লিচেরি, ম্যাঙ্গালোর, বোম্বাই, করাচী—একে একে আমার চোখের সামনে উপস্থিত হল। আমি ক্ষণেক ভেবে উত্তর করলাম—"ভারতের তিনটি দিকই সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত, আর ছোট খাটো সমুদ্রও তারা নয়। তাই এমন সুন্দর দৃশ্য ত আমাদের দেশে আছেই, এতদপেক্ষাও মনোমুগ্ধকর সমুদ্রের দৃশ্য ভারতের উপকূলভাগে রয়েছে। তবে, হ্যাঁ, সমুদ্র স্নানের এই যে মনোরম ব্যবস্থা আপনাদের রয়েছে, তা' আমাদের দেশেতে তেমন নেই। প্রাকৃতিক শোভায় বা উত্তাল তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের দৃশ্য অথবা প্রশস্ত সৈকতভূমি বা সবুজ বৃক্ষাচ্ছাদিত পাহাড় আর সমুদ্রের মুগ্ধকর দৃশ্য—সকলটারই প্রাচুর্য্যে ভরা আমাদের দেশ।"

এই কথা তাদেরকে জানাবার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও আমার মনে হল যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করার অফুরন্ত সুবিধা থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেশে তা' ভোগ করে খুবই কম লোকে, কারণ যাই হোক। কিন্তু ইউরোপের মধ্যে দরিদ্রতম দেশেও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগে লোকের অভাব হয় না। আর যা' নয়, প্রচার মারফৎ তা'ও অপরূপ সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হয়। আর এইভাবে হাজারে হাজারে বিদেশীদের আকৃষ্ট করে দেশের আয় বৃদ্ধিরও চেষ্টা হয়।

পরদিন সকালে সমুদ্রস্নানের আকর্ষণ এড়াতে পারলাম না। বেলা প্রায় এগারোটায় গেলাম সমুদ্রপারে। বলাবাহুল্য পূর্ব্বদিনের পরিচিত দুই ভদ্রলোকও আমার সঙ্গে এসে জুটেছিলেন। স্নানের পোষাক পরে আমরা তিনজনে একটি বেঞ্চে বসে খানিকক্ষণ রোদ উপভোগ করলাম। তারপর একটি ঘাটে গিয়ে জলে নামলাম।

সমুদ্রস্নানে পারের দিকে ঢেউয়ের জন্য বেশ অসুবিধা সৃষ্টি হয়। সমুদ্রের অভ্যন্তরে একটু দূরে ঢেউএর সেই অসুবিধা আর থাকে না। তবে অনেকেরই দূরে গিয়ে স্নানের সাহস হয় না। এইজন্য তারা কোমর জলে দাঁড়িয়ে থাকে, ঢেউ এসে তাদের উপর দিয়ে চলে যায়।

স্নান করতে গিয়ে অভ্যাস না থাকায় সমুদ্রের লবনাক্ত জলে মোটেই আরাম বোধ করলাম না, মনে মনে ভাবলাম—

"সমুদ্র স্নান দূর থেকে দেখতেই ভাল, কিন্তু মোটেই আরামপ্রদ নয়।"

সমুদ্র স্নান শেষ ক'রে এসে একটি ক্যাবিনে গরম পানীয় জলে স্নান করে নিলাম। তারপর সমুদ্র পারেই একটি রেস্তরাঁয় আহার শেষ করলাম।

রেস্তরাঁতে বসে জন কয়েক ভদ্রলোক একখানি দৈনিক কাগজের একটি ছবির সঙ্গে আমার চেহারার মিল দেখে তাঁরা সকলেই উঠে আমার কাছে এলেন। এসে ছবিখানা আমার সম্মুখে ধরে জিজ্ঞেস করলেন—"আপনিই না ?" আমার উত্তর শুনে তাঁরা খুব খুশী হলেন, বললেন—"এমনভাবে যে আপনার দেখা পাব, ভাবতেই পারিনি।" আমি উত্তর করলাম—"আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করে আমিও খুব খুশী হলাম।"

ভার্ণা যে অঞ্চলে অবস্থিত, সেই অঞ্চলটি শস্য সম্ভারে সমৃদ্ধ। কিন্তু এই সমৃদ্ধির বেশীর ভাগটাই রুমানিয়ার কবলে, অর্থাৎ ভার্ণার পেছনের দিকটাই দব্রুজা অঞ্চল, যা বর্ত্তমানেও রুমানিয়ার দখলে।

বুলগেরিয়া দেশটিতে পাহাড়ও যেমন আছে, সমতল অঞ্চলও তেমন আছে। আর জল বায়ুও তেমন খারাপ নয়। শীতকালে মরে যাওয়ার শীতও যেমন এই দেশে পড়ে না, তেমন গরম কালেও গরমের আতিশয্যে লোকে ছটফট করে না। আবহাওয়া মোটের উপর বেশ উপভোগ্যই থাকে।

বুলগেরিয়া দেশটি ছোট্ট কৃষিপ্রধান ও দরিদ্র হলেও এর যাতায়াতের ব্যবস্থা মোটের উপর বেশ ভাল। 'বেশ ভাল' অর্থ এই নয় যে মসৃণ চকচকে ঝকঝকে রাস্তা দেশের চারিদিকে বিস্তৃত রয়েছে। তবে যাতায়াতের রাস্তাঘাট দেশের সর্ব্বত্রই রয়েছে, রেল লাইনও দেশের সর্ব্বত্র আছে।

পরদিন বৈকালে জাহাজঘাটায় এসে উপস্থিত হলাম, মনের ইচ্ছা—জাহাজে কৃষ্ণ সাগরের জলবায়ুর কিছু অভিজ্ঞতা নিয়ে বুরগাস বন্দরে যাওয়ার। টিকিট পূর্ব্বেই কাটা হয়েছিল।

শণিবার অপরাহ্ণ। দেশের স্কুল কলেজ, অফিস আদালতের অর্দ্ধ ছুটির দিন। সপ্তাহের সাড়ে পাঁচটি দিনের এক ঘেয়ে কাজে ক্লান্ত কেরাণীকুল, স্কুল কলেজের ছেলে ছোকরা সকলেই যেন এই দিনটির দিকে চাতক পাখীর মত তাকিয়ে থাকে। সপ্তাহের এই অপরাহ্ণ তাই এনে দিল সকলের দেহে মনে এক অপূর্ব্ব মুক্তির আনন্দ। আর সেই মুক্তিজনিত আনন্দটুকু ঘরের কোণে পুরানো পরিবেশে উপভোগ করতে বহু জনেই ছিল অনিচ্ছুক। তাই তো জাহাজঘাটায় ছেলে ছোকরা, তরুণ তরুণী, বৃদ্ধ বৃদ্ধার এক বিপুল সমাবেশ আমার চোখে পড়ল। জাহাজের পর জাহাজ দাঁড়ানো, সকল জাহাজই যাত্রী সাধারণে পরিপূর্ণ।

কোন জাহাজ চলেছে বুরগাস, কোনটি চলেছে ইস্তানবুল, কোন কোনটি চলেছে রুশ দেশের দু-একটি বন্দরে। আরও কত জাহাজ কত দিকে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে।

ছুটো দিনের নির্ম্মল আনন্দ ভোগের জন্য অধিকাংশের এই ছুটোছুটি। কা'রও সঙ্গেই বিশেষ কোন মালপত্র নেই, কা'রও সঙ্গে আছে একটিমাত্র স্যুটকেশ, কারও বা আছে পৃষ্ঠে বাঁধা একটি থলে। আর যাদের সঙ্গে মালপত্রও রয়েছে, তারাও তা নিজেরাই বহন করল। আমিও যে মাল বহনে ছু-একজনকে সাহায্য না করলাম, এমন নয়। আর আমার প্রয়োজনকালেও অন্যের সাহায্য আমি পেয়েছি। মোট কথা, যে ইউরোপের লোকেরা বিলাসব্যসনে অভ্যস্ত, তারা নিজেদের মাল হাতে ক'রে চলতে মোটেই লজ্জা বা সঙ্কোচ বোধ করে না।

জাহাজঘাটায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লোকজনকে মালপত্র বহন করে জাহাজে উঠতে দেখে আরও একটি বিষয়ের কথা মনে পড়ে গেল। বিষয়টি প্রাসঙ্গিক না হলেও খুব যে অপ্রাসঙ্গিক, তা নয়। বিষয়টি আমাদের দেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোকদের কথা। অবস্থা আমাদের যেরূপই হোক, ঝি চাকর ছাড়া ঘরকন্না করা আমাদের স্ত্রীলোকদের পক্ষে হয় বিশেষ কষ্টসাধ্য, অনেকে অপারকও হন। অবস্থা একটু ভাল হলে ত কথাই নেই, বাড়ীতে ঝি চাকরের অন্ত থাকে না। যে ইউরোপের বিলাসিতার কথা হয় এত প্রচারিত, সেই ইউরোপের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শতকরা প্রায় আশী নব্বইটি বাড়ীতেই নেই কোন ঝি চাকর। আর তাদের বড়লোকদের বাড়ীতেও আমাদের দেশের মত এত ঝি চাকরের ছড়াছড়ি

নেই। তাইত ইউরোপ আমেরিকার বহু লোকেই আমাদের দেশে বাড়ীতে বাড়ীতে এত ঝি চাকর দেখে হয় আশ্চর্য্য। ইহার অবশ্য কারণও আছে। ইউরোপের ঝি চাকর আরও দশজন মানুষের মতই থাকে। তারাও সপ্তাহান্তে ছুটি ভোগ করে, মাইনেও তারা বেশ পায়। কিন্তু আমাদের দেশে ঝি চাকর পোষা তেমন ব্যয়বহুল নয়, মাইনে ত নামমাত্র। মানুষের কর্ম্মশক্তির এমন অপচয় কিন্তু ইউরোপ আমেরিকার কোথাও আর দেখা যায় না।

এক একটি জাহাজ যাত্রা স্বুরু করে, অমনিই চারিদিককার লোক হাত নেড়ে, রুমাল উড়িয়ে, টুপি খুলে হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ের বিদায় অভিনন্দন আর শুভেচ্ছা প্রকাশ করল। ক্রমে জাহাজঘাটা শূন্য হয়ে পড়ল, চারিদিক গাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত হল।

রাত্রি ভোর হল। আর একটি নূতন দিনের নূতন প্রভাতে দেশের একটি নূতন সহরের দ্বারপ্রান্তে এসে আমাদের জাহাজখানা পৌঁছল। পারের আলোগুলি একে একে নিভে গেল। রাস্তায় লোক চলাচল আরম্ভ হয়েছে, গাড়ীঘোড়া এস্তব্যস্ত হয়ে ছুটেছে।

সূর্য্যোদয়ের শুভ বার্ত্তা ঘোষণা করে পূব আকাশ সোনালী আভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আর দেরী নেই ভেবে সূর্য্যোদয়ের দৃশ্য উপভোগের জন্য জাহাজের উন্মুক্ত ডেকের

রেলিং ধরে আমার মত আরও জনকয়েক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পূব আকাশের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

পূব আকাশ ক্রমেই রক্তিম আভায় বেশী উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তারপর যৌবনের উদ্দামতায় প্রচণ্ড বেগে অদৃশ্য লোক থেকে চোখের নিমেষে যেন এক লাফে পূব আকাশের খানিকটা উপরে সূর্য্যদেব এসে দেখা দিলেন। তারপরই সুন্দর এই পৃথিবীর মোহে সূর্য্যদেব যেন আবদ্ধ হলেন, তাঁর ত্বরিৎ গতিবেগ স্তব্ধ না হলেও ধীর হয়ে পড়ল।

সূর্য্যোদয় দেখে মনে মনে ভাবলাম—"এমন কেন হয়? উদয়ের কালেই বা সূর্য্য এমন ত্বরিৎ বেগে সমুদ্র থেকে বেশ খানিকটা উঁচুতে এসে দেখা দেয় কেন, আর অস্ত গমন কালেই বা তার গতি হয় ধীর কেন, যেন ইঞ্চি ইঞ্চি করে ডুবে অদৃশ্য হয়?"

জাহাজ ভিড়ল। এখন নামবার তাড়াহুড়া লাগল। গায়ে গা ঠেকিয়ে লাইন করে যাত্রীরা সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল।

সহরে পৌঁছে একটি মধ্যশ্রেণীর হোটেলে উঠলাম। এই বুর্গাস সহরটি অন্যান্য নামকরা সহরের তুলনায় অপেক্ষাকৃত আধুনিক, একেবারেই নূতন বলা যায়। ব্যবসার দিক থেকে ইহাই দেশের বৃহত্তম বন্দর। সমুদ্র স্নানেরও সুযোগ সুবিধা এখানে রয়েছে।

এই সহর থেকে মাইল দশেক দূরে ঐ একই নামের আর একটি যায়গা আছে। এখানে উষ্ণ প্রস্রবণ রয়েছে। এই প্রস্রবণের জলে স্নান করলে বিভিন্ন রোগ আরোগ্য হয়। (এই ধরণের উষ্ণ প্রস্রবণ কিন্তু পূর্ব্ববাংলায় চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত সীতাকুণ্ডতেও রয়েছে)। এইজন্য বহু রোগীর এখানে আগমন হয়, অবশ্য সুস্থ লোকও কম আসে না। আমিও এখানে এসে একবার স্নান করে নিলাম। স্নান করলাম রোগ নিরাময়ের জন্য নয় বা পুণ্য সঞ্চয়ের আশায়ও নয়, করলাম অভিজ্ঞতা লাভের জন্য।

সহরে প্রত্যাবর্ত্তনের পর হোটেলে এসে বিশ্রাম করলাম। বৈকালে সহরের চারিদিকে একবার ঘুরে সন্ধ্যায় এসে সাগর পারে বসলাম। সহরটি কৃষ্ণ সাগরের পারে অবস্থিত নয়, অবস্থিত বুরগাস উপসাগরের পারে। ইহার প্রাকৃতিক দৃশ্য মন্দ নয়, তবে এই সহরের বিপরিত দিকে উপসাগরের মুখে সজোপোল সহরটির অবস্থান আরও চমৎকার, সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যও আকর্ষণীয়।

পরদিন সহর ছেড়ে রওনা হওয়ার জন্য জিনিষপত্র গোছগাছ করে নিলাম। অল্প সময়ের মধ্যেই যাদের সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় হয়েছিল, তাদেরও অনেকেই এসে আমাকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে গেল।

ইউরোপের মধ্যে এই দরিদ্রতম দেশেও লেখা পড়ার চর্চ্চা বা জানবার শুনবার ইচ্ছা লোকের কত, তা' একটি ঘটনা

থেকেই পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়। প্রায় পাঁচ শত বৎসর তুরস্কের পরাধীনতা থেকে যখন এই দেশ মুক্তিলাভ করে, তখন এইদেশে স্কুল কলেজও যেমন ছিল না, তেমন কোন সংবাদপত্রও ছিল না। যে দু-একটি সংবাদপত্র ছিল, তা দেশের বাইরেই ছাপা হত। আর স্বাধীনতালাভের পর বছর ত্রিশ চল্লিশেকের মধ্যেই শূন্য সংখ্যা থেকে সংবাদপত্রের সংখ্যা দাঁড়াল ২০৫। তারমধ্যে দৈনিক সংবাদপত্রের সংখ্যাই অধিকাংশ। (আমাদের বাংলা দেশের সংবাদপত্রের সংখ্যার সঙ্গে একবার তুলনা করলে অনেকের মনই নৈরাশ্যে ভরে উঠবে)। বর্ত্তমানে ঐ সংখ্যা আরও কিছু বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভোর রাত্রিতেই রওনা হব বলে তখন আর হোটেলের বিল মেটানো সম্ভব হবে না মনে করে রাত্রিতেই সকল কাজ সেরে সকাল সকাল শুয়ে পড়লাম।

রাত্রির মাঝখানে রাস্তায় কতকগুলি কুকুরের চীৎকারে আমার ঘুম গেল ভেঙ্গে। চারিদিকে চেয়ে দেখলাম—ফর্সা। ঘড়ি দেখবার আর খেয়াল হল না। চারিদিক ফর্সা দেখে ভোররাত্রি ভেবে ত্রস্তব্যস্ত হয়ে রওনা হয়ে পড়লাম।

ক্রমে সহর পার হয়ে গেলাম। চারিদিক নিস্তব্ধ, কোথাও কোন প্রাণের স্পন্দন নেই। কেবল মাঝে মাঝে কুকুরের চীৎকারে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হল। এই নিস্তব্ধ পরিবেশে চলতে গিয়ে মোটেই আরামবোধ করলাম না। কিসের জন্য যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। বোধ হয় ভয়ের দুর্ব্বলতা

এসে মনের কোণে স্থান পেয়েছিল। তাই দ্রুত চলে কোন জনপদে এসে খানিকটা বিশ্রাম করে নেব—মনে মনে তাই ভাবলাম। আর ততক্ষণে মোরগের ডাক যে প্রভাতের বার্ত্তা বহন করে আনবে, সেবিষয়েও ।নশ্চিত ছিলাম।

দ্রুত চললাম। সহর পার হয়ে মাঠে পড়লাম। মাঠ পার হয়ে একটি গণ্ডগ্রামে পৌঁছলাম। কিন্তু পরবর্ত্তী গ্রামে বিশ্রাম করব বলে আর চলায় বিরতি হল না। পরবর্ত্তী গ্রামও এল। সেখানে বিশ্রামের যায়গা কোথায়? দোকান-পাট বন্ধ, কোন রেস্তরাঁও খোলেনি। সুতরাং বিশ্রাম করা হল না। মনের ভয় মনেই চেপে রেখে চললাম। ক্রমে গ্রাম পার হলাম ত মাঠে পড়লাম, মাঠ পার হলাম ত গ্রাম এল। আকাশের দিকে তাকাই, চারিদিকে চেয়ে দেখি, কিন্তু কোথাও ভোরের লক্ষণ চোখে পড়ল না। অবশেষে ঘড়ি দেখতে আমার লেদারকেশ খুললাম, দেখি রাত তিনটা। আমি ত অবাক।

এই দেশটিতে আমার অবস্থানকাল প্রায় শেষ হল। আর একটিমাত্র দিন বাকী। এরই মধ্যে সীমান্ত পার হয়ে আমাকে যেতে হবে, নচেৎ বিনানুমতিতে অবস্থানের দোষে আমি হব আইন মতে দোষী, আর তার ফলভোগও অনিবার্য্য। সুতরাং ধীরে সুস্থে চলে দৃশ্যভোগের আর সময় নেই, পথে প্রান্তরে লোকজনের সঙ্গে হাস্যপরিহাস বা আলাপ আলোচনায়ও আর কালক্ষেপ করার সময় নেই। তাই একমনে অবিরাম

চললাম। চলায় বিরতি হল কম, পরিশ্রম হল খুব। তবুও চললাম।

মধ্যাহ্নে একটি সহরে এসে পৌঁছলাম। স্নানাদি না করে একটি রেস্তরাঁয় চটপট আহার সেরে খানিকটা বিশ্রাম ক'রে পথে বেরুলাম। ঘুর হলেও বড় রাস্তায় চলেছি, চলেছি আইতোষ, শ্লিভেন, নর্থ-জাগোরার পথে।

জাগোরায় এসে রাত্রিবাস করলাম। এই সহর থেকে একটি ছোট রাস্তা সোজা গিয়ে প্লভদিভ হয়ে তুরস্কের প্রধান পথে গিয়ে মিশেছে।

অসুবিধা হলেও সময় এবং রাস্তা সংক্ষেপ করার জন্য পরদিন সকালে ঐ ছোট রাস্তাই ধরলাম।

রাস্তার অবস্থা যে মোটেই ভাল নয়, তা' বলাই বাহুল্য। রাস্তা নামের অযোগ্য এই পথে চলতে গিয়ে কত অসুবিধাই না বোধ করলাম। মনে মনে দেশটির সরকারের প্রতি বেশ বিরূপ হলাম। পরক্ষণেই স্থানীয় অধিবাসীদের যাতায়াতের অসুবিধার কথা ভেবে তাদের প্রতি আমার সহানুভূতিও হল যথেষ্ট। কিন্তু লোকজনের সঙ্গে ইসারায় ইঙ্গিতে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজীতে কথা বলতে গিয়ে বুঝলাম যে এরা ঐ কদর্য্য রাস্তা পেয়েই কত খুসী! একজন ত আমাকে বলল—"পূর্ব্বে ত এই রাস্তাও ছিল না। এখন ত স্বাধীন হয়ে আমাদের সরকার রাস্তাঘাট রেলপথ তৈয়ারীতে মন দিয়েছে, আমাদের গ্রামে গ্রামে শিক্ষার ব্যবস্থাও করেছে। আমাদের অভাব অভিযোগ

সম্পূর্ণ দূর নিশ্চয়ই হয়নি, তবুও ত দূর করার একটা ঐকান্তিক চেষ্টা হচ্ছে। এই রাস্তা, ঐ ছোট্ট স্কুলটি, আর ঐ ঔষধালয় তার প্রমাণ।”

রাস্তার পাশে একটি গ্রামের রেস্তর াঁয় বিশ্রাম করলাম। পাশের দু-একটি ছেলে ছোকরাকে জিজ্ঞেস করলাম—“ধর্ম্মে তুমি কি?” উত্তরে জানলাম—তারা কেউ কেউ খৃষ্টান আর কেউ কেউ মুসলমান। মুসলমান আর খৃষ্টান হলেও দেশের প্রতি সকলেই তারা একইরূপ অনুরক্ত।

হারমনলিতে এসে ছোট রাস্তা বড় রাস্তার সঙ্গে মিশেছে। এখানে এসে যখন পৌঁছলাম, তখন অপরাহ্ণ। এখান থেকে সীমান্ত সহর সুইলেনগ্রেডে এসে পৌঁছলাম সন্ধ্যা সাতটা সাড়ে সাতটায়।

সাইকেলে সীমান্ত পার হওয়া অপেক্ষা ট্রেনে সীমান্ত পার হওয়া সহজ বেশী ব'লে বুলগেরিয়ার পূর্ব্ব সীমান্তে ঐ সহরটিতে এসে স্টেশনে অপেক্ষা করলাম, অপেক্ষা করলাম তুরস্কগামী একটি ট্রেনের জন্য।

সুইলেনগ্রেড ছোট্ট সহর। সহর এবং স্টেশনের মধ্যে মারিযা নদী। নদীর উপরে একটি পোল। এই সহরে গুটিপোকার চাষ হয়। ঐ হারমনলি জেলায়ও সিল্ক তৈয়ারী হয়।

প্যারী—ইস্তানবুল যাতায়াতকারী এক্সপ্রেস ট্রেনটি সময়মতই এসে সুইলেনগ্রেড স্টেশনে থামল। আমি উঠে যায়গা মত

বসলাম, সাইকেলটিকে দিলাম ব্রেকভ্যানে। অল্পক্ষণের মধ্যেই যাত্রী সাধারণের মালপত্র পরীক্ষা হয়ে গেল, ট্রেনটিও ছেড়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে বুলগেরিয়ায় আমার ভ্রমণও শেষ হয়ে গেল। ভ্রমণ শেষ হলেও বিগত দিনগুলির কত সুখস্মৃতি আমার চোখের সামনে এখন ভেসে উঠতে লাগল। ফলে মনটা ক্ষণেকের জন্য বড়ই বিষাদক্লিষ্ট হল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রেনটি সীমান্ত পার হয়ে তুরস্কের অন্তর্গত প্রথম সহরে এসে পৌঁছল। আর একটি নূতন দেশের নূতন মাটিতে আমি পদার্পন করলাম।

বহু শৌর্য্যবীর্য্যের অধিকারী, ইউরোপে এশিয়ার সংস্কৃতি-বাহক নব অরুণ আভায় উদ্দীপ্ত তুরস্কের ভূমিতে প্রথম পদার্পনেই আমি বিপুল আনন্দবোধ করলাম। সঙ্গে সঙ্গে সংস্কারমুক্ত পুরুষ কামালের বিরাট কীর্ত্তির কথা, নব তুরস্কের কথা মনে হতেই বিস্ময়ে আমি অভিভূত হলাম।